ভারতে সমর সঙ্কট

শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী লাইব্রেরী

৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৪৫

প্রকাশক
শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
সরস্বতী লাইব্রেরী

মূল্য—১৷৷০

মুদ্রাকর—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
শ্রীসরস্বতী প্রেস
১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

যাঁদের চিন্তা, কর্ম্মশক্তি, প্রাণপাত চেষ্টা ও ত্যাগ-
বীর্য্যের তপস্যার উপর দেশের সব কিছু
নির্ভর করে, কালকার সত্যকে ধরার জন্য
আজকার খেলাঘরের খেয়ালে যাঁরা
মশগুল—তাঁদের শ্রীকর-কমলে
আমার এ দীন অর্ঘ্য সশ্রদ্ধ
অন্তরে নিবেদন
করলাম। ইতি—

গ্রন্থকার

ভারতে সমর-ক্ষত

ডাঃ শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এম, বি
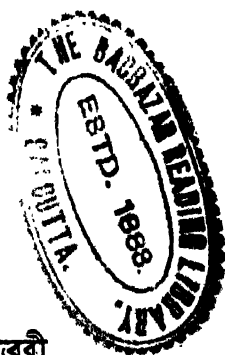
সরস্বতী লাইব্রেরী

৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
সরস্বতী লাইব্রেরী

শ্রীসরস্বতী প্রেস
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভারতে সমর সঙ্কট

কথার কথা

আমরা বেশ আছি—খাই দাই, ঘুমাই। চোর, ডাকাত তাড়াতে পুলিশ আছে; বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে আছে ইংরাজের গুলি, গোলা, বন্দুক, কামান, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, সৈন্য-সামন্ত। না আছে আর 'বিশে-বোদের' ভয়, না আছে সেকালের চেঙ্গিস্ খাঁ, সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, কিম্বা কতকটা সেদিনকার নাদির সা বা আহাম্মদ সা আবদালীর ভীম বিক্রমে বিজয় তাণ্ডব। এমন কি 'বর্গী এল দেশে'—এ ঘুমপাড়ান গানটাও নিতান্ত মিছে কথা হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অস্তিত্বটাও মিছে হ'তে বসেছে।

আমরা অস্বীকার করছিনে, 'ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্'এর মত এ সব বিপদ আপদ অযাচিত ভাবে আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ত। তবু তাকে ঠেকাতে ত ছিলাম আমরা—তা' সে প্রয়াস আমাদের ব্যর্থ হ'ক আর সার্থক হ'ক। মারের মার দিতে জানতাম ব'লে তেমন দুর্দ্দিনে আমরা 'মরিয়া না মরে রাম' হ'য়ে বসবাস করছিলাম। এখন যে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক অবসাদ ছেয়ে ফেলেছে। মাংস পেশীর সঙ্গে স্নায়ুরও পক্ষাঘাত হয়েছে। এমনটাত তখন ছিল না। তা' ছাড়া সত্যই কি আমরা এমন নিরাপদ শান্তিতে আছি যে দৌরাত্ম্যের মাথা উঠাবার দফাটা একেবারে রফা হ'য়ে গেছে? আঁধার ঘরে বদ্ধ থেকে থেকে আমাদের চোখের জ্যোতিঃ কমে যায়নি ত, যাতে ক'রে দূরে আলোয় মেলা দেশগুলোর সাজ-সজ্জা আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না? কিম্বা পরের উপর সব ভার, সব দায় তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকে থেকে নিরীহ হ'য়ে যাওয়ার অভ্যাসগত ফলে কিছু জান্‌তে চাই না, বুঝতে চাই না, ভাবতে পারি না, মাথা ঘামাতে ভাল লাগে না? যবে-স্ববে থাকৃতে থাকৃতে জড়-ভরতত্ব প্রাপ্তি হওয়ায়, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায় আমরা খুইয়েছি। তাই বিপদের মাঝে বাস ক'রে চোখ বুঁজে মনে করছি—বেশ আছি। নিজের জান, মান, ঘর, বাড়ী, জরু, গরু বিষয় আশয় রক্ষার চেষ্টা-চরিত্রের পরিশ্রম ও দায় থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেছি। অত ঝঞ্ঝাট ভোগে কে? আমাদের দরকার হয়ত মরুক গুর্খা, আফ্রিদি, হাইল্যাণ্ডার,—ভাবনা কি? দাও ফেলে কর্ত্তাদের খাজনা ট্যাক্স, মান ওদের

আইন-কানুন, কোন বালাই নেই। কেমন নির্ঝঞ্ঝাট! সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবার পথ এমন আর নাই! এটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হ'তে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বের দাবীর অনুকূল নয়। আমরা চাইব স্বরাজ, আর দেশরক্ষা করবে ওপারের "জনবুল"? কাজ হ'বে এক জনের আর সব ঝক্কিটে পোয়াবে আর একজন? এরকম বোঝাপড়াটা শয়তানের মস্তিস্ক-প্রসূত বুদ্ধির ইন্দ্রজাল হ'তে পারে; দৈত্যদানবের সম্বর বিদ্যার অন্তর্গত কোন ব্যাপার হ'তে পারে; চতুর লোকের ফতুর করার কারসাজী হতেও বা পারে। কিন্তু আপনার পায়ে দাঁড়াতে পারা, চোখ চেয়ে চলার শক্তিধারণকারী, মান-সম্ভ্রমের জীবন যাপন করনেওয়ালা মানুষের পক্ষে একথা খাটে না। আমরা মানুষ হ'তে চাই ব'লে এ বুজরুকি ছাড়িয়ে উঠতে চাই। দেবতা হ'তে চাইনে, ফেরেস্তা বা দেবদূত হতে চাইনে, অতি-মানুষ হতেও না। শুধু ততটুকু অধিকারের অধিকারী হ'তে চাই, যা' এ মাটির পৃথিবীতে নশ্বর দেহ নিয়ে, সুখ-দুঃখের জল-হাওয়া-আলোয় প্রাণমন দিয়ে জাগিয়ে, বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। আমাদের ঢেকেরাখা ঝাপসা কুয়াসার বুক ফুঁড়ে-ফাঁক করে যে আলোর জৌলস চকমক্ করে জ্বলে উঠছে, তার মদিরায় মত্ত হ'য়ে বিপদ-বিভ্রাটে আর আর জ্যান্ত মানুষের মত প্রাণগুলো নিয়ে অকুতোভয়ে যাতে আমরাও ছিনিমিনি খেলতে পারি, তারও সাজ সরঞ্জাম আজ চাই। নিত্য অনিত্যতার পারে দাঁড়িয়ে, মাথা তুলে খাড়া থাকার শক্তি-সামর্থ্য আহরণ করবার দিন এখন এসেছে। তার ডাক থেকে কাণ ফিরিয়ে নিলে আর

চলবে না। আমাদের অবস্থা হয়েছে—'আমি ছাড়ি কিন্তু কম্বলত ছাড়ে না' গোছের। সে ভাল্লুকের মরণ-আলিঙ্গন যে আরও নিবিড় করে ধরে রাখে। নির্ব্বিবাদে, স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকপাতা, কন্দ মূল খেয়ে, ছেঁড়া কপনি এঁটে, মার খেয়ে তবু না মেরে এত ক'রে সব চেয়ে সভ্য সেজেও জগৎসভায় হেয় ও অপদার্থই থেকে গেলাম। আর যারা মারপিটের গুরুঠাকুর তারা অবসর মত ভালবেসে ও দরকার মত কৃষ্ণবুলি আওড়ে, মরা-কান্না কেঁদে, 'মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বং' ইত্যাকার মোহমুদ্গর ভেঁজে একটা ফাঁকা আদর্শবাদ আকাশ বুড়ীর সূতার মত আসমানে উড়িয়ে দিয়ে আসর সরগরম রেখেছেন। যস্মিন্ দেশে যদাচার—আমাদেরও খালি মসী ছেড়ে গুরুদত্ত মন্ত্র সেধে মায়া-মরীচিকা পার হ'তে হবে ; তস্মাদ্ উত্তিষ্ঠ।
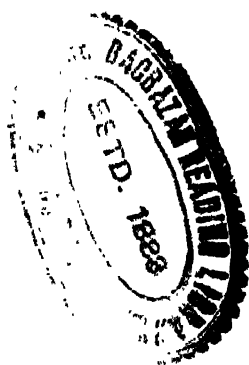
মেঘ সঞ্চার।

এমন একদিন ছিল যখন সাগরের নীল জল দিগন্ত প্রসারিত থাকায় আব বরফের টোপর-পরা মেঘ-বিলাসী পাহাড়ের আড়ালে বাস করায় আমাদের গায়ে বাইরের কুটোটি উড়ে লাগতে পেত না। ক্রমে ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমীর দেখা দিল। গ্রীক্, শক্, হুণ, তাতার, পাঠান, মোগল একে একে যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াতে বেড়াতে এসে আমাদের তোষাখানা, বালাখানা, বৈঠকখানা, চণ্ডীমণ্ডপ দখল ক'রে বসল। দলে দলে আরব, পর্ত্তুগীজ, ডচ, ডেনিস, ফরাসী, ইংবেজ প্রভৃতি এসে ঠাকুরদালানের চালচিত্র ধরে টান মারলে। আমরা একটা অস্ফুট, উদ্ভট শব্দ করে পাশ ফিরে শুলাম। কালের প্রভাবে পরে যদি বা ঘুম ভাঙ্গবার মত হল, শুয়ে শুয়ে দু' একটা

কথা ফিস্ফাস্ করে কইতে লাগলাম, তবু 'কত রবি জ্বলেরে—কেবা আঁখি মেলেরে' অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।

নিখিলনাথের তীর্থযাত্রায় জগতের যত জাতি গণ-বে-গণে বেরিয়েছিল। গরুর গাড়ীতে, নৌকোয়, রেলে, ষ্টীমারে, মোটরকারে, এরোপ্লেনে, যে যা'তে পারে এগিয়ে যেতে লাগল। পাড়াবেপাড়ার লোক, নিকট দেশ, দূর দেশের যাত্রীরা সবাই মহা কুতূহলে, আনন্দ-কল্লোলে চল্তে লাগল। ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি গরুর গাড়ী চ'ড়ে ভারত পাল্লা দিতে বেরুল—মোটর এরোপ্লেনের সঙ্গে। পাড়াপড়শীদের খবরও সে রাখত না। আপনা-আপনির মধ্যে কাউকে তোড়ে সাম্নে ঠেলে চলতে না দেখে সে ভাবতেই পারছিল না, শামুকের গতি নিয়ে খরগোসের সঙ্গে টোক্কর দেওয়ার চেষ্টাতে কিছু ধৃষ্টতা হ'তে পারে। ঐ ঢিলে-ঢালা ভাবটাকেই ভেবে বসল তার নিজত্ব ব'লে।

সে দিন কি হ'ল জানি না, বিশ্বে যেন নূতন রকমের একটা নড়চড় দেখা দিল। কড় কড় ক'রে বাজ পড়তে লাগল, স্বন্ স্বন্ ক'রে পাগলা হাওয়া বইতে লাগল, মুহুর্মুহু ভূমিকম্প হ'তে থাকল, আকাশ থেকে তারার উপর তারা খসে পড়তে লাগল, সারা আকাশ জুড়ে গেরুয়া রঙের ফানুষ উড়তে লাগল। ভয়, মোহ, বিস্ময় কেটে গেলে জানা গেল বিশ্ব-সঙ্গীতে সেদিন তাল ফেরতা হল, নতুন তানে, নবীন উল্লাসে, সুরের ধারা আর একমুখে বইতে আরম্ভ করেছে,—ঘুম ভেঙ্গে, স্বপন টুটে, চোখ রগড়ে দেখি প্রাচী আবার প্রাচীর দিকে ঘুরেছে, সে

তার বাণী বিশ্বের দরবারে হাজির করবে বলে নিঃস্বের খোলস ফেলে দিতে চায়।

চীন, জাপান, ফিলিপাইন, পারস্য, মিশর, তুর্কী, ভারত সবাই আজ মুক্তির আস্বাদনে প্রাণের রসে সহস্র বাহু বাড়িয়ে আকাশছোঁয়ার মত্ততায় নেচে উঠেছে। নিজের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকার জেদ সব বাঁধন, সব গণ্ডী ছাড়িয়ে ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ স্ফুরণ করে সব অশুচি দূর করছে।

জাতে-জাতে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে আধুনিক কালে সম্পর্কের যে হের-ফের হচ্ছে, তার আন্দাজ পাবার জন্য নীচে লেখা নক্সাগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে যেতে হবে।

প্রথম অবস্থা—১৯০২-১৯২১। প্রাচ্যও প্রতীচ্যের সম্পর্ক,—জাপান ও বৃটেন বন্ধুতায় গলাগলি, ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে বৃটিশের স্বর্ব্বস্বার্থ সংরক্ষিত। রুশের দক্ষিণে অভিযান, জাপানের বৃটিশ সাহায্যপ্রাপ্তিতে চালমাত। সেই সুবিধায় সুদূর প্রাচীতে জাপানের যোলকলা উৎকর্ষ-সাধন। মিত্রগণের সাহায্যে প্রশান্ত-উপকূলে আমেরিকার স্বত্ব ও স্বার্থে ব্যাঘাতহীনতা, ওদিকে ব্রিটেন খোলা হাত পা নিয়ে মধ্য ইয়ুরোপ থেকে জার্ম্মানের হুমকি প্রতিরোধে সক্ষম।

সাঁজোয়া ও বর্ম্মের মধ্যে ফাঁকই বল, আর আগুন জ্বালাবার জায়গাই বল (১) চীনের দুর্ব্বলতা (২) ভারত সাম্রাজ্য (৩) ফরাসী অধিকারে ইণ্ডোচায়না (৪) প্রাচ্য ভূখণ্ডের দ্বীপপুঞ্জ (৫) শ্বেত জাতির নিবাস করা অষ্ট্রেলিয়া, (৬) আমেরিকার দখলে ফিলিপাইন।

দ্বিতীয় অবস্থা বা বর্ত্তমান অবস্থা। জাপান Pacific Pact ও Arm Conference এর ফলে পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে নূতন সম্পর্ক স্থাপন ক'রেছে। সোভিয়েট রুশিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে একটি উদীয়মান ধূমকেতু, অথচ সে পাশ্চাত্যের সঙ্গে একরকম সংযোগ-মুক্ত।

জাপানের ইংরাজের সঙ্গে মৈত্রী-সন্ধি আর নাই। তাকে মাঝে খাড়া করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নতুন সমবায় বা সহযোগের ঘোঁট গঠন সম্ভাবনা।

আমেরিকা তার পূর্ব্বেকার বহির্জ্জগতের নির্লিপ্তি ছেড়ে প্রাচ্যে নতুন সহযোগ গঠনে প্রয়াসী। ইংরেজ আমেরিকার মন কষাকষি। ব্রিটেন ও ফ্রান্স Washington Conference এ গৃহীত প্রশান্তোপকূলে পূর্ব্বাবস্থার রক্ষণের সর্ত্তে ভীতিহীন। ঐ তন্ত্রে জার্ম্মান আসর থেকে বিতাড়িত। চীন আজ এক সম্রান্ত মক্কেল।

ফলে—(১) চীন পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন।
(২) ভারতে ইংরাজের সুরাহা।
(৩) ফ্রেঞ্চইণ্ডিজও সুরক্ষিত।
(৪) শ্বেতজাতির অষ্ট্রেলিয়া, ও
(৫) ফিলিপাইনের পূর্ব্ববৎ ভাব।

এ পাঁচটি গোলযোগের বা ভয়ের স্থান, কিন্তু Pacific Coast এর বন্দোবস্তের অধীনে।

অবস্থা—ভবিষ্যৎ। প্রাচ্য জাতিসমূহের নতুন
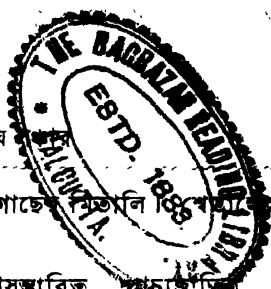
সমবায়। প্রাচ্যে নতুন গোছগাছের মিতালি [illegible] জগতে প্রাচ্যজাতির স্থান।

(১) সোভিয়েট রুশিয়াসম্ভাবিত প্রাচ্যজাতির মিলনে শক্তিসম্পন্ন।

(২) নতুন জগতের প্রতিযোগিতায় যোগ্যতমের জয়ক্ষেত্র চীন।

(৩) জাপানের আমেরিকা-বিমুখতা নব নব ঘটনায় বেড়ে উঠল।

(৪) বিষুবরেখা (Equatorএর) সন্নিহিত প্রশান্তসাগরের দ্বীপে কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ায় প্রাচ্যে ঢোকার সিংহদ্বার আগলে সে (জাপান) বসল।

(৫) শ্বেত-অষ্ট্রেলিয়া—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দ্বীপের লোকের হাতে ঘা খাবে। অর্থাৎ জাপান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হবে।

(৬) প্রাচ্য-সমবায়ের সঙ্গে জার্ম্মানের সখ্য সম্ভাবনা।

(৭) অদূর প্রাচীতে (তুর্কী, পারস্য, মিশর) গোলযোগ।

(৮) ভারতের উত্তর হ'তে নতুন বিপদের সম্ভাবনা। আগে যে সব জায়গা দুর্ব্বলতার চিহ্ন ছিল, সেই সব জায়গায় নবযুগের প্রতিযোগিতার কষাঘাত পড়ে উদ্বাস্ত করে তুলবে।

(৯) ইণ্ডোচায়নার মিত্রের অভাবে ফরাসী বিপন্ন।

(১০) ফিলিপাইনের অদৃষ্টে বিধিলিপি রহস্যময়।

(১১) মধ্য এশিয়ার প্রবেশ-দ্বারের চাবি সিঙ্গাপুরে।

(১২) ডচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ রাজনৈতিক মৈত্রীর অভাবে অরক্ষিত।

(১৩) দখলীকৃত প্রশান্তমহাসাগরের অংশে আমেরিকাব যুক্ত-রাজ্য আত্মরক্ষায় ব্যস্ত।

বিগত যুদ্ধ ও আমেরিকার অস্ত্র-সংযমের বৈঠকে যে সলা-পরামর্শ হ'য়ে সন্ধির পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তাতে এ সব অনাসৃষ্টি টেনে এনেছে ও আনছে।

যোগাযোগ

দুনিয়াটা যারা মুঠোর মধ্যে পূরে ভাগ-বাটোয়ারা করার জন্য রাজনৈতিক দাবার চাল দিয়েছে তাহাদের খেলার কায়দাটা বোঝার জন্য গোটাকতক কথা বলা আবশ্যক। তাহ'লে কেমন ক'রে কি হবে বুঝতে পারব।

আমেরিকা থেকে জাপানকে প্রাচ্য জাতি ব'লে অপাংক্তেয় করে বিতাড়িত করায় জাপানের রাজনীতিবিদেরা দেখলে একটা দেওয়াল তুলে প্রাচী-প্রতিচীকে ঠাঁই ঠাঁই করে দেওয়া হচ্ছে। এ রকম গোছের প্রাচীর অবশ্য আগেও ছিল, তবে কিনা কূট-রাজনীতির মিষ্ট ভাষায় সেটাকে ফুল-পাতায় বাহারী করে ঢাকা হয়েছিল। রাজনীতির খেলোয়াড় পণ্ডিতরা ভবিষ্যতে এ ব্যবধান তোলার কথা যে ভাবেই আলোচনা করুন না কেন,

আজকের দিনে এ ঘটনাটি দুনিয়ার জাতিতত্ত্ব বা রাজনীতির ধারাটীকে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তন করেছে।

দেশবিদেশের লোককে আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া না দেওয়া আমেরিকার ঘরোয়া সমস্তার বিষয়—মন্ত্রী-সংসদ এ কথা বল্লেও একথা সত্য যে জাপান প্রাচীতে প্রাচ্যজাতির মুকুটমণি হ'য়ে ঘরে ফিরল। এই যে কূটনীতির মোড় ফিরান হল—এতে জগতের শান্তির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাবার ভয় রইল। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় থেকে আমেরিকা-জাপানের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবার জাপানের সম্প্রসারণ নীতির ফলে মাধুর্য্য হারিয়ে নতুন পথ ধরল। জাপান যে অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যস্থতা করার দর্প নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আজ তা ভূমিস্থাং হয়ে গেল। এর ফলে অর্থনীতির দিক থেকে প্রাচীতে আমেরিকার বানিজ্যের ক্ষতি হবে। জাপান জাতি-বিদ্বেষের পাশে এশিয়ায় এশিয়ার আধিপত্যের ধুয়া তুলবে। এশিয়ার স্বার্থ এখন প্রকৃতই বদলে গেছে। ইতিহাসে এই প্রথম—এক অবস্থায় পড়ে জাপান, চীন ও রুশিয়ার মধ্যে সখ্যতা বন্ধন সম্ভব হল।

কেমন করে এই অসম্ভবটা সম্ভব হতে চলেছে, তার একটু আলোচনা করা যাক। এ আবশ্যকীয় সমস্যাকে দু'ভাবে ভাগ করা যেতে পারে—সাখালিনের (Sakhalene) তৈল-ক্ষেত্র ও চীনের প্রাচ্য রেলপথ। সাইবিরিয়ার সাখালিন নিয়ে চারটি জাত এবং একটি সদাগর জড়িয়ে পড়েছে। তেলের খনির মালিক হচ্ছে রুশ। তেলের দরকার হচ্ছে জাপানের। সিন-ক্লেয়ার পূর্ব্ব থেকে রুশের সঙ্গে বন্দোবস্ত-করা সদাগর।

গ্রেটবিটেন Shell Companyর বাহানা সমর্থন করে, এবং অপর একটি পক্ষ হচ্ছে আমেরিকা।

জাপানের যুদ্ধ-জাহাজের জন্য এখন কালিফর্ণিয়া থেকে তেল আনতে হয়। আমেরিকার সঙ্গে যার মনকষাকষি, সে তেলের জন্য আমেরিকার উপর নির্ভর করতে পারে না। পারস্যে জাপান সুবিধা পায় নি, রুমেনিয়ায় আমেরিকার Standard Oil Company একাধিপত্য ক'রে নিয়েছে, কাজেই সাখালিন জাপানের একমাত্র ভরসাস্থল, আর বাড়ীর কাছেও বটে। ১৯২০ সালে সোভিয়েট রুশের হাত থেকে উত্তর সাখালিন জাপান কেড়ে নেয় (দক্ষিণ সাখালিন ত রুশ-জাপান যুদ্ধেই দখল হয়)। দেশের লোকেরা চায় না বলে কতকটা, আর রুশকে এখন হাতে রাখা দরকার বলেও জাপান সাখালিন ছেড়ে আসতে রাজী আছে। তবে সে তেলের সম্বন্ধে ৯৯ বছরের ইজারা চায়। প্রতিদানে সে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে প্রকৃত রুশ-সরকার ব'লে স্বীকার করবে। সিনক্লেয়ার আর জাপানকে নিয়ে রুশ একটা মীমাংসার চেষ্টায় আছে। খুব সম্ভব জাপান যা চায় তা না হলেও তার কাছাকাছি একটা কিছু পাবে। আমেরিকা এ বিষয়ে দো'টানার ভিতরে প'ড়েছে। সে সোভিয়েটের প্রাধান্য স্বীকারে একেবারে অসহিষ্ণু। আবার সে অপর পক্ষে জাপানের সমৃদ্ধিও দেখতে পারে না। যদি রুশকে দাবাতে যায় ত পরম শত্রু জাপানকে ওখানে থাকতে দিতে হয়। আবার যদি জাপানকে তাড়াতে যায় ত রুশের সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করে নিতে হয়। সুতরাং

মার্জ্জিনের প্রাচ্য-বিদ্বেষী আইনের ফলে চীনের ঘোর আমেরিকান বিদ্বেষ, জাপানের আমেরিকার উপর বিজাতীয় ক্রোধ, আর রুষের আমেরিকার হাতে অমান্য ও স্বার্থহানিতে এই তিন জাতি একজোট হয়ে পড়েছে।

Chinese Eastern Railway—চীনের এই রেলপথ Chita থেকে Vladivostok যাবার সোজা রাস্তা। তা' ছাড়া Peking, (আজকাল নাম হয়েছে পিপিং) Port Arthur ও ইউরোপকে একসূত্রে গেঁথেছে এই লোহার রেল। এই রেলটি নিয়ে যাবতীয় বড় শক্তিগুলির মধ্যে ঘোঁট হওয়ায়, এই রেলপথ Washington Arms Conferenceএ আলোচ্য বিষয় হয়। রুশ ও চীন সরকার বলে এ রেলপথটি তা'দের একমাত্র স্বার্থের বিষয়। তবু উপরপড়া হয়ে ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা এতে মাথা ঢোকায়। আমেরিকার স্বার্থ সোভিয়েটের শত্রুতা-প্রণোদিত। কিছুদিন পূর্ব্বে চীন রুশের সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করে নেওয়ায় (recognition) উভয় পক্ষে যে গুপ্ত সন্ধি হয়েছে, তা' বড় সুন্দর। একটু ইতিহাসের কথা বলি। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের হাতে চীন পরাজিত হ'লে রুষ ফ্রান্স থেকে টাকা তুলে ধার দিয়ে, চীনের এই রেল করে দেয়। একটা সর্ত্ত করা হয় যে এই রেল-কোম্পানীর অংশীদার শুধু চীন বা রুশরাজের প্রজারা হ'তে পারবে। ১৯১৮ সালে জাপান যে গুপ্ত সন্ধি করে, তাতে চীনকে বলতে হয় যে দরকার হলে ঐ পথে জাপানী সৈন্যকে সে যেতে দেবে। যুদ্ধের সময় রেল কোম্পানী আমেরিকা থেকে কতকগুলি আবশ্যকীয় জিনিষ খরিদ করায়

আমেরিকা একটু মুরুব্বিয়ানার সুবিধা সেই উপলক্ষে করে নিয়েছে। ফরাসীদের অজুহাত হচ্ছে যে তাদের টাকায় কাজ হয়েছে, সুতরাং তারাও অংশীদার। যুদ্ধের গোলমালে সব কর্ত্তা মিলে এই রেলপথের মালিকানি করেছেন। ১৯২০ সালে চীন নিজের হাতে নিজের বিষয়ের ভার নিতে চায়, তারপর রুশের সঙ্গে চীনের শেষ চুক্তি হয়। এখন শোনা যাচ্ছে রুষ-চীন-জাপানের মধ্যেও একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তা'তে দাঁড়িয়েছে এই যে চীন ও রুশ এ পথের সর্ব্বময় কর্ত্তা, অপর কোন পক্ষকে তারা মালিক বলে স্বীকার করেনা। দেশটা চীনের আর টাকাটা রুশের, তাই দু'জনের মিল রাখার দরকার হয়েছে। জাপানের অবস্থা এমনি যে, তাকে রেলপথে কিছু কিছু সুখ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে মাত্র। এমনি করে আমেরিকা ও ফ্রান্সের বৈরাচরণে তিনটি বিরুদ্ধ-স্বভাব শত্রু আজ মৈত্রী-ডোরে আবদ্ধ হয়েছে। এমনি করে একদিন ইংরাজ, ফ্রান্স ও রুশ একত্র হয়েছিল বলেই কালে তারা জার্ম্মানকে নষ্ট করতে পেরেছে। কে জানে এই নতুন ত্রয়ীর ভাগ্য-লেখা কি বলে?

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আমেরিকাকে নিয়ে প্রাচ্য-প্রতিচীর একটা বোঝাপড়ার অবস্থা এসেছিল। জাপান আধুনিক জাতদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলতে চায়; চীন বাঁচবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কচ্ছে; ফিলিপাইন স্বাধীন হবার জন্য অস্থির হয়েছে; ভারতও বন্ধন ছিন্ন করার জন্য আড়মোড় দিচ্ছে ও এসবের ভিতর দিয়ে প্রাচ্যে বৈষম্যের মধ্যে একটা সাম্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ১৯২১ সালের

অস্ত্র-কনফারেন্স আর তার সঙ্গে সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে শক্তিদের মধ্যে আপোষে একটা নিষ্পত্তি মহালাভজনক ব্যাপার মনে হলেও জাতি বা বর্ণ-বিদ্বেষে সব ভালটুকু নষ্ট করতে বসেছে। প্রশান্তোপকূলে একটা মিটমাট উড়ে গিয়ে এদিকটা জগৎ-জোড়া বিপৎপাতের উর্ব্বর ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজাতীয় বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন চীন, জাতিত্যক্ত একঘরে রুশ, প্রতিহংসাপরায়ণ জাপান এখন খেলার একটা নতুন ছক আঁকবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গা-জোয়ারীতে চ'লে জাপান চীনকে চটিয়েছিল। পরে রাজ্য-বিস্তারের পিপাসায় বিগত মহাযুদ্ধের শেষা-শেষি জাপান সাইবিরিয়ায় যাওয়ায় উভয়ের মধ্যে, ক্ষণভঙ্গুর হলেও ভবিষ্যতে বন্ধুত্বের একটা পথ খুলে গিয়েছিল। ভারতের বিদ্রোহী আত্মাও আজ রুখে দাঁড়িয়েছে। জাপান শত্রুর অসময় বুঝে এ সময় রাজনৈতিক দৌড়ে কর্ম্মঠ সঙ্গী পাবে। উত্তরে রুশ প্রতিচীর কল-কারখানার সভ্যতার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছে, তার তাল এশিয়ার ঘরে ঘরে এসে পৌচেছে। নবজাগ্রত, সম্পূর্ণ-মুক্ত স্বাধীন তুর্কী ও আফগানের প্রাণ-সঞ্চারী নিঃশ্বাস-পরশে ভারতের হৃদপিণ্ডে ফুল্ল আলোড়নের নব বেগ সংক্রামিত হবে। সেদিন পিকিনে চীন ও রুশিয়ার রাজনৈতিক আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছে। সেইটেকে উপলক্ষ ক'রে ভবিষ্যতে বিশ্বশক্তির নতুন গোছগাছ হতেও পারে। চীনের সাঁকোয় দাঁড়িয়ে রুশ-জাপান মিলতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দুয়ের শাসনতন্ত্রের আদর্শ বিভিন্ন হওয়ায় এ রকমটা সম্ভব কি না ? কথা হচ্ছে, বাস্তব জগতে কূটনীতির সংঘ বা স্বার্থের মিলন বড়

মিলন। শ্বেতাঙ্গের ঔদ্ধত্য, বাড়াবাড়ি নষ্ট করার উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে প্রাচী। জাপান পাশ্চাত্য জাতের সংসর্গে এতদিন লাভবান হলেও ফিরে এখন ডাণ্ডা ধরতে পারে।

প্রাচীর এ জাগরণের তলে শুধু জীবন রক্ষার এঁটোকাঁটার কাড়াকাড়ি নেই। সে আজ জগতের শীর্ষস্থানে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব করতে চায়। এইটে তার মর্ম্মকথা। জাপানের লোকেরা প্রাচ্য শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে প্রতিচীর কামান, এরোপ্লেন ও রণ-নৃসংশতার ভাষায় তার প্রাণের কথা বলার শক্তিলাভ করেছে। রণতরী, উড়োজাহাজ বা কলকার-খানার প্রাধান্যের ভিতর দিয়ে কথা না বল্‌তে পারলেও এগুলোর ধূর্ত্ততা ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে নিতান্ত বিরক্ত হয়েছে এমন নির্ব্বাক অংশও এশিয়ায় আছে। কাজেই ইউরোপ-আমেরিকার বিরুদ্ধে এদের মিলন অবশ্যম্ভাবী। এই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রাচ্য ভূখণ্ডে অদূর ভবিষ্যতে করালীর ভেরী নিনাদ শুনা যাবে। এই জন্যই যদি বলা যায় 'সাধু সাবধান', 'যে যার ঘর সামলাও' তাহলে মহাপাতক করা হবে না।

যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত জার্ম্মান জ্বালাতন হ'য়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে, এটা একটুও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। সে তাই লগ্ন খুঁজে বেড়াবে, সুখসুবিধামত নতুন দলাদলির সৃষ্টি করবে, অথবা পাকা ঘোঁট পেলে তাতে যোগ দেবে। ফরাসী ও ইংরাজের গোস্তাকি সে ভুলতে পারবে না। ফরাশীর বুদ্ধি, ক্ষাত্র প্রতিভা; আর ইংরাজের চিরকেলে গুণ্ডা ভাড়া যোগান—এ দু'টার মনিকাঞ্চন যোগ যে জার্ম্মানকে অবশেষে সর্ব্বস্বান্ত করেছে

—মার্কিন প্রেসিডেণ্ট Wilson এর 'চোদ্দ-দফা-সর্ত্তের' কদর্থ করে তাকে ধনে-প্রাণে মারার যোগাড় করেছে, এ কথাটা জার্ম্মাণী যতদিন পেটে খিদে থাকবে, মাথায় বুদ্ধি থাকবে, বুকে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগবে ভুলতে পারবে না। এদের ক্ষতি করতে গেলে, এদের প্রাচ্যের সাম্রাজ্য যাতে নষ্ট হয়ে যায় তাই তাকে করতে হবে। সুতরাং ভারত ও ইণ্ডোচায়নার দিকে তার দৃষ্টি পড়বে। সে নিজে কিছু করতে পারবে না; তবে এসব দেশের লোকের মতি-গতির ফের-ফার উপলক্ষ করে কাজ করবে, বা প্রবল সঙ্গী পেলে তার সঙ্গে যোগ দেবে।

জাপানের কথা

Anglo-Japanese Alliance থাকায় যুদ্ধের সময় সাধারণতঃ প্রাচীর তথা ইংরাজ-সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাপান বহু পরিশ্রম করেছে। তার সৈন্য তার নৌ-বহর সর্ব্বদা ব্যস্তভাবে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। ১৯১৫ সালে সিঙ্গাপুরে পাঠান সৈন্যরা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'লে জাপানী এসে সহায়তা করে যথাবিধি সামরিক নিয়মে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করতে প্রস্তুত হয়েছিল। নির্ব্বাসিত ভারতীয় রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রার্থীদের বহিষ্করণ ক'রে ইংরাজের মন জুগিয়েছিল। বিখ্যাত রাসবিহারী বসু, হেরম্ব-গুপ্তের নাম সবাই এই প্রসঙ্গে শুনে থাকবেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য যিনি আজকাল মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে জগদ্বিখ্যাত

বলশেভিকনেতা হয়েছেন, তিনিও ওখানে পায়ের ধূলা দিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিপ্লববাদীরা দেশে শুধু রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তন চায় বলে, সকল সভ্যদেশে তাদের আশ্রয় দেওয়ার রেওয়াজ আছে। নাই কেবল এনার্কিষ্টের বেলা। কেন না, সে দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সামাজিক ওলট পালট চায়, রাষ্ট্র মোটেই চায় না। ভারতের মুক্তিকামীদের মধ্যে বৈধ আন্দোলনকারী বা Constitutional agitators ছাড়া রাজনৈতিক বিপ্লবী আছে বলে শোনা যায়, কিন্তু এনার্কিষ্ট নাই। আর এনার্কিষ্ট কথাটা দর্শনের দিক থেকে অপছন্দসই জিনিষ না হলেও কার্য্যতঃ রাজ্যপাটের যেমন মাথাই হক না, তাকে তেমন তেমন কায়দায় ফেলে কেউ কেউ মেরে ফেলায় ও কথাটারও একটা কদর্থ হয়েছে। এনার্কিষ্ট কথাটা বে-বিচারী খুনী অর্থে ব্যবহৃত হয়ে একটা গালাগালে দাঁড়াবার যো হয়েছে। ভারতের মুক্তি-চেষ্টার উপর বৈদেশিকদের সহানুভূতি পাছে হয়, তাই আগে থেকে জড় মেরে রাখার জন্য বৃটিশ প্রোপাগেণ্ডিষ্টরা এদের এনার্কিষ্ট নামে চালিয়ে-দিয়েছিল। জেনে শুনে কেউ কাজের কাজী এনার্কিষ্টকে স্থান দেয় না। যে সময়ের কথা বলছি তখন বিশ্ব-বিশ্রুত চীনের মুক্তিদাতা সান-ইয়েৎ-সেনও দেশ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাপানে আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু ভারত ভারত ব'লে, ইংরেজের অধিকৃত ব'লে, ভারতবাসীর বেলা অন্য অবস্থা হল।

বর্ত্তমান জাপানকে গ'ড়ে তোলার অন্যতম কর্ম্মী কাউণ্ট ওকুমা তখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ইংরাজের খয়ের-খাঁ-

গিরিতে জাপানের বেশী লাভ হবে ভেবে, এরকম বিধান দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ধান ভানতে শিবের গীতও জগতকে একাধিকবার শুনতে হয়েছিল। তিনি নিতান্ত অকারণে নিষ্কামভাবে ইংরাজকে Good moral characterএর certificate দিয়ে ভারতের মুক্তিকামীদের মুণ্ডপাত করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতার সার হচ্ছে যে ইংরেজ ভাগবতজন— ভারত পতিত অধম; ইংরাজ তার যৎপরোনাস্তি ভাল কচ্ছে। এমন কেউ কারুর করতে পারে না। কতগুলো অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত হতভাগা অনর্থক হৈ-চৈ করে সে পুণ্যব্রতের অন্তরায় হচ্ছে। এদের জন্য নতুন নরক চাই, পুরান নরকে ঠাঁই হবে না। অবান্তর হলেও এই সঙ্গে এ রকম আরও কয়েকটা জাল বা বাঁজা সার্টিফিকেটের কথা বলতে চাই। এই রকম সময় বরাবর জনকতক ভারতবাসী ভারতের ইংরাজ-রাজত্বের কাল-দাগ-লাগা, পচা, ছ্যাতলাধরা দিকটা লোক-চক্ষুর সামনে ধরায়, বাহিরে ভারত সম্বন্ধে ইংরাজের প্রেমের জারিজুরি অনেক কমে যায়। এমন কি, নানা রকম Cartoon বেরুতে আরম্ভ করে। আমেরিকার একখানা কাগজে একটা ছবি দেয়, তাতে ছিল এক মত্ত হস্তী শুঁড় তুলে বীর দাপটে চলেছে, মাহুত বেচারী ছিঁট্‌কে পড়েছে। মাহুতের সাহেবী বেশ। ডিগবাজী খেয়ে পড়তে পড়তে মাহুত প্রভু বলছেন,— Confounded beast, forgets I am his master! আর একটা ছবিতে এক হ্যাটকোট-ওলা দাঁড়িয়ে আছেন—চারিদিকে Royal Bengal Tiger তাকে ঘিরে ধরেছে। তার ঘর্ম্মাক্ত কলেবর,

আর বন্দুকটি হস্তচ্যুত। তিনি ফ্যাকাসে মুখে বল্‌ছেন, 'All's quiet in India.' মায়াজাল কেটে যায় দেখে সদাশয় বৃটিশ প্রোপাগ্যাণ্ডিষ্টরা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট Taft ও রুষভেণ্টের সার্টিফিকেট কাগজে কাগজে দাখিল করলেন। সেগুলিরও সারমর্ম্ম ওকুমা প্যাটার্ণের। শুধু মুখের কথায় মানে না দেখে, যোধ-পুরের Sir Pratab Singকে আমেরিকায় পাঠান হল। Sir Pratab রাজপুত, অতএব বীরকেশরী, স্বদেশ বৎসল। তার উপর যোধপুরের জঙ্গী-সর্দ্দার, অতএব বড় position-ওয়ালা। এর উপর তিনি ভারতবাসী! আর কথা আছে! তিনি বলে বেড়ালেন, "ভারতের সামন্ত-অসামন্ত নরপতিদের থেকে সামান্য প্রজাও ইংরাজের পদানত ভক্ত। স্বাধীনতা চায় যারা, তারা কয়েকটা অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত হতচ্ছাড়ার দল। দেশে তাদের কেউ পোছে না। ইংরাজ বড় ভাল।" সুখের বিষয় সব দেশেই চিন্তাশীল লোক আছে, 'থুথু দিয়ে ছাতুমলার' চেষ্টায় তারা হাসে। এর পর একজন নামজাদা গোয়েন্দা পুলিশ যান। তিনি বছরে ছয়লক্ষ টাকা খরচ করলেও তার কথা পুলিশের কথা বলে সমাদর লাভ করেনি। সেই জন্য বিলাত থেকে প্রোপাগ্যাণ্ডা করার জন্য এক নামী অধ্যাপক আমেরিকায় প্রেরিত হয়েছিলেন। তার পাণ্ডিত্য ও যশ প্রশংসা আকর্ষণ করলেও ভারতের বদ্ ছোকরারা দু'এক কথায় তার চাল মাটি করে দেয়। কয়েকটি ভারতীয় যুবক এক সভায় জানায় ইনি ভারতে কখনও যান নাই, ভারতের শত্রুদের একতরফা লেখা প'ড়ে আবল তাবল বকে গেলেন, স্থানীয় লোক না হ'লে আসল অবস্থা

কিছু বুঝবেনা; অতএব এর কথা প্রামাণ্য হতে পারে না। তারপর ভারত থেকে এক শেতাঙ্গ প্রফেসার যান। এমনি করে ঘরে-বাইরে ভারতবাসীকে কোনঠেসা ক'রে রাখার চেষ্টা চলেছে। ফলে দেশ বিদেশ কোথাও ভারতীয় মুক্তিকামীদের জায়গা নেই। রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতেরা দেশেত স্থান পেলই না, বাইরেও তাদের দুর্দ্দশা ঘুচল না। শ্যাম তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে; বা ধরিয়ে দিয়েছে; চীন তাদের দূর করেছে; জাপান বার করে দিয়েছে; আমেরিকা তাড়িয়েছে, শাস্তিও দিয়েছে, ফরাসীও জেনে শুনে স্থান দেয় নি; পর্ত্তুগীজও তথৈবচ। গোয়া থেকে দুটি বাঙ্গালী যুবক ইংরাজ-পুলিসের হাতে সমর্পিত হয়েছিল। স্বাধীনতার মূল্য যারা বোঝে না, স্বচ্ছন্দে যারা নিজেদের দেশ পরের হাতে তুলে দেয়, তাদের এই প্রকৃত শাস্তি; স্বাধীনতার মূল্য বোঝার—শিক্ষার মত শিক্ষা। পূর্ব্বপুরুষদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই রকমেই ত হবে।

যাক যা' বলছিলাম। জাপানের রাজনীতির দুরূহতা ও জটিলতা বোঝা শক্ত হ'লেও একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত। যুদ্ধ আরম্ভ হলে সান ইয়াৎ সেন পরামর্শ দিয়েছিলেন—জাপান, জার্ম্মানীর সঙ্গে যোগ দিক, তা হলে দূর থেকে জার্ম্মান প্রাচ্য দখল করতে আসতে পারবে না; অথচ যুদ্ধের ফাঁকে ইংরাজ-ফরাসীর কর্ত্তৃত্ব প্রাচ্য থেকে দূর হয়ে যাবে। ভারত, চীন স্বাধীন হয়ে থাক, জাপান তাদের সর্দ্দার হয়ে একটা বিরাট প্রাচ্য সমবায় গড়ে তুলুক। ওকুমা অবশ্য অন্যরকম বুঝেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এসময় ইংরাজের পক্ষে থাকলে জাপানের

ব্যবসা-বিস্তার যথেষ্ট হবে, জার্ম্মাণীর ব্যবসার বাজার তার হাতে চলে আসবে; টাকাও ঢের হবে। যুদ্ধের হুজুগে সৈন্য-সামন্তও যথেষ্ট তৈরী হয়ে যাবে। তার পর শুভমুহূর্ত্ত দেখে নারায়ণ স্মরণ করলেই হবে। ভারতবর্ষ থেকে বিপ্লববাদীরা বিদেশে গিয়ে ভারতের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে', বাইরের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছিল। জাপানে যারা ছিল, তারা বেগতিক দেখে সংবাদপত্রের কয়েকজন সম্পাদক ও Party leaderদের সঙ্গে আলাপ ক'রে দাঁড় কবায় যে জাপান ভুল রাস্তা নিয়েছে। এই ভাবের ভাবুক সেদেশেও অনেক ছিল। ফলে ওকুমার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। ওকুমার পতন ঘটে। এত করে যখন শান্তির দিন এল, ইংরাজ তাকে মৈত্রী থেকে ছেঁটে ফেলতে চাইলে। জাপান প্রবল হয় এটা অষ্ট্রেলিয়া চায় না; আর চীন-ভারতে ব্যবসা-বিস্তার ইংরাজ ও আমেরিকার অসহ্য। তাই স্থির হ'ল Anglo-American Alliance আজকের দিনের দরকার। এবার জাপানকে ফতুর না করলে বাড়ীর আনাচে কানাচে সে বেড়িয়ে বেড়িয়ে অনিষ্টপাত করে বসবে। জাপান দেখলে 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাঁজী.'; ইংরাজ চীনে চারণ-ভূমি নিয়ে জাপানের ইদানীং মর্ম্মান্তিক শত্রু আমেরিকার সঙ্গে জুটে তাকে প্রাধান্য করতেত দেবেই না, তা' ছাড়া প্রশান্ত-কূলে তাকে ঢোঁড়া করে রাখার চেষ্টা করবে। সেদিন তাই সে ফোঁস করে উঠল। জাপান বলে সে পড়ে মার খাবার পাত্র নয়, এর শোধ সে নেবে। তাকে বাঁচতেই হবে। সে জন্য তিনটে পন্থা ঠিক করে রেখেছে :—

(১) জাপান, ভারত ও রুশে বন্ধুত্ব স্থাপন। (রুশের সৈন্যসংখ্যা ১৫,০০,০০০। রুশের ১৬-১৮ বছরের পুরুষদের বাধ্যতা-মূলক সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়।)

(২) জার্ম্মাণী, তুর্কি, রুশ ও জাপানে বন্ধুত্ব স্থাপন।

(৩) ফ্রান্স, ইটালী ও অন্যান্য লাটিন জাতি ও জাপানে বন্ধুত্ব স্থাপন।

এই তিনটেই একযোগে করতে সে চেষ্টা করবে। যদি সবটায় সফলকাম হয়, ইংরাজ-সাম্রাজ্যের নাম ধরা-পৃষ্ঠ থেকে লোপ হয়ে যাবে। যদি দুটোও লাগে তাহলে ইংরাজের অবস্থা সঙ্কট হবে। একটা লাগলেও ব্যাপার গুরুতর হবে। জাপানের যুদ্ধাভিযানটা হবে এইরূপ। সে তার নৌ-বহর আত্মরক্ষায় ব্যবহার করবে।

চীনও এ অবস্থায় একটা পক্ষ না নিয়ে পারবে না। খুব সম্ভব জাপানের দিকে সে চল্‌বে, ডাঙ্গা-পথে জাপানী সৈন্য মধ্য-এসিয়া দিয়ে কাবুলের সাহায্যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হানা দেবে। ভারতের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সাহায্য ও সহায়তা ক'রে সে তার অভীষ্ট সিদ্ধি কর্‌বে। এ সবই অবশ্য জাপানের কল্পনা। ভারত সত্যি তখন কি করবে ? বাস্তবিক সেটা ভয়াবহ ব্যাপার হ'লেও ভাববার কথা।

ওকুমা পরে রাসবিহারীর পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে 'Asia for the Asiatics' মন্ত্রে সঞ্জীবিত 'Asian Review' পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। তাতে তার ভারত-প্রীতি দেখে কে ? রাজনীতি এমনি জিনিষ, দরকারমত আজ যে মিত্র,

কাল সে শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়। Diplomacy বা কূটনীতি হ'চ্চে বড় শক্ত ব্যাপার, যে এতে প্রখর হ'বে, তার জয়জয়কার। মোটের উপর তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, জাপান এখন ইংরাজের অশুভপ্রার্থী।

ফরাসীর কথা

যুদ্ধের সব চেয়ে ভার সহ্য করেছে যে, সব চেয়ে ক্ষতি হয়েছে তার। লুটের মালের ভাগাভাগির সময় ইংরাজের কামড় হয়ে গেছে বড়। ফরাসীর ভাগ্যে পড়েছে যৎকিঞ্চিৎ। শুধু সিরিয়া নিয়ে সে কি করবে? এদিকে তার টাকার দরকার। জার্ম্মান নানারকম ছলা-কলার সাহায্যে একটা পয়সাও দিতে নারাজ। ফ্রান্স চাইলে গায়ের জোরে আদায় করতে। রুর (Ruhr) প্রদেশ সে সসৈন্যে দখল করলে। ইংরাজ ওদিকে দেখলে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন জার্ম্মান ত গেল, কিন্তু ফ্রান্স যে ক্ষাত্রশক্তিতে বড় হয়ে উঠল। ফ্রান্সের 'সদাই প্রস্তুত' সৈন্যের (Standing army) সংখ্যা ৭২০,০০০; তাছাড়া ২৫ বছর বয়সের নীচে ছোকরা-সৈন্য শিক্ষিত ক'রে রাখা হয়েছে

২০,০০,০০০। সমস্ত বৃটিশ এম্পায়ারে সশস্ত্র সৈন্যের সংখ্যা ১০,০০,০০০। ফ্রান্সের অভ্যুদয় ইংরাজ সহ্য করতে পারে না। সে তাই জার্ম্মানকে একেবারে টিপে মারতে চায় না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত সে এই দুটো জাতকে ব্যবহার করে থাকে। নেপোলিয়ানের অধীনে ফ্রান্সের উত্থানের দিনে জার্ম্মানীর সাহায্যে তাকে হীন করেছিল। কৈসর দ্বিতীয় উইলিয়ামের অধীনে মাথা-জাগিয়ে-তোলা জার্ম্মানকে ফ্রান্সের সাহায্যে থর্ব্ব করলে। আর ঐ দুটো জাত পাশাপাশি থাকায়, এবং সাহস, শৌর্য্য ও যুযুধান অবস্থায় থাকায় পরস্পরে অহি-নকুল সম্পর্ক ক'রে রেখেছে। ইংরাজ যেমন ফ্রান্সের কল্যাণ দেখতে পারে না ব'লে তার বিপদে উদাসীন রইল, ফ্রান্সও তেমনি ইংরাজের উপর উল্টে চাল দিলে। ইংরাজের চালাকি ধ'রে ফেলে' উল্টো কিস্তি দেবার জন্য ফরাসী দুটো রাস্তা ধরেছে। একটা বড়ে টিপে ইউরোপে তার স্থান দৃঢ় করেছে, আর একটায় এশিয়ায় ইংরাজ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি ভয়সঙ্কুল করে তুলছে। ইউরোপে Poland, Rumania, Czecho-Slovokia, Jugo-Sloviaকে টাকা ধার দিয়ে, নানা রকমে মুরুব্বিয়ানা করে এমনি একটা অবস্থা করে তুলেছে যে, ইংরাজের জর্ম্মান-বটিকা প্রয়োগের প্রতিষেধক কতক কতক তার হাতে হয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গেলে সেও নিজের চেষ্টায় মধ্য-ইউরোপে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। তাতে ইংরাজ ঘর নিয়ে ব্যতিবস্ত হয়ে পড়বে। কেননা ইংরাজ চায় না, বায়ু-পিত্ত-কফের সাম্যের মত ইউরোপীয় শক্তিদের সাম্যে ব্যাঘাত ঢুকে বিতি-কিচ্ছি একটা কিছু ঘটে যায়। তুর্কিকে

ইংরাজ বে-কায়দা করতে চায়; ফ্রান্স তা' চায় না। ইংরাজের ভয় তুর্কি বড় হলে সব মোসলমানের সহানুভূতি নিয়ে মোস্লেম সমবায় সৃষ্টি করে, ভারতের ভিতর প্রবল গোলযোগ বাধিয়ে দিতে পারে। কাজেই তাকে সে চাপতে চায়। ফ্রান্স ইংরাজের মর্ম্মস্থলে ঘুরিয়ে ঘা দিতে আপত্তি করে না।

এই ফাঁকে কামাল পাশা আপনার কর্ম্ম ফতে করেছিলেন। আর একটা কথা। ইটালী আজ প্রবল শক্তি হয়ে উঠছে। বেশী এগুতে না দিয়ে তাকে আওতায় ফেলে রাখার জন্য ইংরাজ মেডি-টারেনিয়ন পার করে এশিয়া মাইনরে গ্রীককে বসাতে চেয়েছিল। ইটালী এ চাল ধরে ফেলে, সেও তুর্কির প্রতি প্রসন্ন হয়। তুর্কিকে কেউ মারতে চায়, কেউ বাঁচাতে চায়—এইরকম অবসরে তুর্কির নতুন দেশভক্ত বীরেরা ইটালীর প্রসন্নতা কাজে লাগিয়ে নিলে। এ রকম আন্তর্জাতিক বিদ্বেষের ফলে দুর্ব্বল জাতি টিঁকে যায়। প্রব-লের অসুবিধায় দুর্ব্বলের সুবিধা, বিশেষতঃ যদি হাতে হাতিয়ার থাকে। এ যাবৎকাল আপনা-আপনি খাওয়াখায়ির ফলে জারের অধীনে রুশ তুর্কিকে গ্রাস করতে পারেনি। চীনের মাথা চিবুতে চিবুতে ছেড়ে দেয়। রুশ-জাপান যুদ্ধ ত এই উপলক্ষে হয়েছিল। চীন-তুর্কি এ দুটো জাত এমনি করে কয়েকবার বেঁচে গেছে।

আমেরিকার কথা

আমেরিকা ফিলিপাইনে প্রাধান্য রাখতে চায়। চীনে তার ব্যবসা-বিস্তার খুব হয়েছে। তার মিশনারী সভ্যতা, শিক্ষা ও ধর্ম্ম ছড়াতে কোমর বেঁধে, লেগে গেছে। বাড়ীর কাছে জাপান। সে মাথা তুলে উঠেছে। প্রাচ্যে মুরুব্বি সে থাকতে চায়। তার মানে পাশ্চাত্য জাতিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এখানে খাটো করা তার দরকার। সে কাজে চীনে আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লেগে গেল—এক মহাদেশের লোক বলেও বটে, পড়শী বলেও বটে; ধর্ম্ম ও সংস্কারের অনেক মিলও আছে। তাই জাপান নাবালক চীনের গার্জ্জেন বা অছি হতে চায়। এর মানে হচ্ছে যে, যদি সম্ভব হয় চীনকে উদরসাৎ ক'রে জাপান বড় হবে। নয়ত বন্ধুত্ব ক'রে

দুজনে বেড়ে উঠবে। নানা কারণে প্রথমটা হল না ব'লে জাপান দ্বিতীয় পথ নিয়েছে। আমেরিকার তাতে পকেটে হাত লেগেছে। ওদিকে চীনের এবং জাপানী কারিগর ও মজুররা আমেরিকার সমাবস্থার অধিবাসীদের রুটী মারছে বলে আমেরিকার লোকমত জাপানের বিরুদ্ধে। তাই অর্থনৈতিক কারণে দুটো জাতিতে বিরোধ। একটা নৌ-যুদ্ধেরও সম্ভাবনা আছে। ফিলিপাইন হারানরও ভয় আছে। আজ হ'ক দুদিন বাদে হ'ক, জাপানকে যুদ্ধে নামতে হবে। অর্থনৈতিক কারণে ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে জায়গা বাড়াবার ইচ্ছায় লড়াই সুরু হবে। তারপর সে আগুন চারদিকে ছেয়ে পড়বে। যার যা মনে আছে, সে তেমন সুগতিক দেখে তাই করতে লেগে যাবে। কাজেই নতুন ক'রে পক্ষ যাচাই ও বাছাই হবে। রাজনীতি বা কূটনীতিতে কায়েমি শত্রু-মিত্র বলে কিছু নেই। সুখ-সুবিধার খাতিরে সব চলতে পারে।

প্রাচ্য সমস্যার জটিলতা বুঝতে গেলে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করতে হয়। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে আত্ম-প্রাধান্য বাড়ানর জন্য ইংরাজ পিকিনে রাজদূত পাঠিয়ে ব্যবসার অজুহাতে রাজ-নৈতিক পাকা আড্ডা বসায়। ভিতরে ভিতরে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ের গোলযোগ বাধিয়ে সেখানে একটা আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে আফিংএর ব্যবসা চীনরাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অব্যাহত রাখার জন্য এক লড়াই বাঁধিয়ে হংকং দখল করে। ক্রমশঃ বারটা বন্দরে তার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। ইয়াংসি নদী দিয়ে ইংরাজের অবাধ গতিবিধি চলতে থাকে। উত্তর থেকে রুশও চাপ দিতে থাকে।

১৮৮৩-৮৪ সালে ফরাসীও ছল ক'রে যুদ্ধ লাগিয়ে আনাম ও টংকিং আত্মসাৎ করে। রুশের বন্দর না থাকায় সে বাহির জগতে হাত পা মেলবার রাস্তা খুঁজতে বদ্ধপরিকর হয়। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ ইংরাজের চালবাজীতে বন্ধ হয়। কাজেই সে পূর্ব্ব পথে ঝুকল। ক্রমে ভল্যাডিভষ্টক আয়ত্ত করল। কিন্তু বরফের উৎপাতে অসুবিধায় পড়ে পোর্ট আর্থারের দিকে নজর দিল। এখানে বসতে পারলে সে কোরিয়া দখল ক'রে প্রাচ্য ভূখণ্ডে অপ্রতিদ্বন্দী হবার চেষ্টা করবার ইচ্ছা রাখত। ' ইংরাজের চেয়ে তার জোর তখন চীনের উপর খাটত। ইংরাজ চিন্তিত হল। চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়াতে লাগল। ঠিক এমন সময় ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে হুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়ে জাপান পোর্ট আর্থার দখল করলে। এতে ইংরাজ রাজনীতিকদের চোখ খুলল। তারা প্রাচীতে রুশকে জব্দ করার জন্য একটা ক্ষাত্রশক্তি-সম্পন্ন মিত্র খুঁজছিল। চীন সে সংজ্ঞায় পড়েনি, জাপান পড়ল। চীন এখন থেকে মিত্র হিসাবে অগ্রাহ্যের বিষয় হল। রুশকে ভাড়িয়ে জাপান ও বৃটিশের চীনে লুটে পুটে খাবার পথ সুগম ও পরিষ্কার হল। রুশ কিন্তু এ চাল ধরে ফেলল। ফ্রান্স, জার্ম্মাণীর সঙ্গে মিলে সে জাপানকে ধমকে পিছু হটিয়ে দিলে—জাপান চীনকে পোর্ট আর্থার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে জার্ম্মাণী লুটের মা লের ভাগ নেবার ইচ্ছায় ৯৯ বৎসরের জন্য কিয়াচ (Kiachau) ইজারা নিল। রুশ এই ব্যাপারে ছল ধ'রে চীনকে বাধ্য করে ২৫ বছরের জন্য পোর্ট আর্থার ও ট্যালিয়েন ওয়ান

লিখিয়ে নেয়। গ্রেটব্রিটেনও সেই সুযোগে উল্টো চাল দেবার জন্য ওয়াই-হাই-ওয়াই ঐ রকম সময়ের জন্য ইজারা নেয়। পোর্ট আর্থার ও ওয়াই-হাই-ওয়াই, চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৌ-বহরের আড্ডার উপযোগী স্থান দুটি তার হাতছাড়া হয়ে গেল। ইংরাজ ১৯০২ সালে জাপানের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করল। কড়ার হল একজনের সঙ্গে যদি আর কেউ চড়াও হয়ে লড়াই করে, তবে অন্যজন মিটমাটের চেষ্টা করবে। আর যদি অপর কেউ বন্ধুর শত্রুর সঙ্গে যোগ দেয় তা হলে বন্ধুর সাহায্যার্থ এ পক্ষকেও যুদ্ধে নামতে হবে। এ সখ্যের ফলে জাপান রুশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভরসা পেল। কেননা ফ্রান্স ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার ভয়ে রুশের সঙ্গে যোগ দিতে পারল না। ১৯০৫ সালে এই সখ্যের সর্ত্ত একটু বদলে ব্যাপকত্বের রূপ নিল। এবার বলা হল ভারতের তথা প্রাচীর শান্তি ও পরস্পরের স্বার্থ-রক্ষার জন্য যেমন এক জন যুদ্ধে নামবে, অমনি দ্বিতীয় ভাগিদারকে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। শত্রুপক্ষের সহযোগীর জন্য অপেক্ষা করা চলবে না। ১৯০৭ সালে এডওয়ার্ড গ্রে বুদ্ধি খাঁটিয়ে রুশের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে সমর্থ হন। তাতে পারস্য, আফগানিস্থান ও তিব্বতের পথে উভয়ের বিরোধ সাময়িকভাবে তিরোহিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৯০৪ সালে ফ্রান্সের সঙ্গেও সখ্য স্থাপন হয়। এরই ফলে গত যুদ্ধে ইংরাজ-ফ্রান্স ও রুশ এক সঙ্গে মিলতে পেরেছিল। ১৯১১ সালে দশ বছরের জন্য জাপানের সঙ্গে সখ্য-সূত্র নতুন করে গ্রথিত হয়।

বর্ত্তমান গোলযোগের আরম্ভ ১৯১৪ সালে। ঐ সালে জাপান

জার্ম্মানীর হাত থেকে সিংটাও দখল করে। ১৯১৫ সালে চীনের উপর ২১ দফা দাবী স্থাপন করে। এর ফলে চীনের স্বাধীনতা একরকম জাপানের করায়ত্ত হয়, ইয়ুরোপ-আমেরিকার ব্যবসা-ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হয়, ইয়াংসিতে ইংরাজের প্রাধান্য খর্ব্ব করা হয়। বড় বিপদে ব্যাপৃত থাকায় রুশ, ফ্রান্স, ইংরাজ কথাটি বলতে পারেনি। ফ্রান্স ও রুশ ১৯১৬-১৭ সালে গোপনে জাপানের সঙ্গে একটা সন্ধি করে। তাতে ক'রে তারা অঙ্গীকার করে যে, যুদ্ধে জয়ী হয়ে জার্ম্মানীর প্রাচ্য রাজ্যাংশ জাপানকে দেওয়া হবে। ১৯১৭ সালে আমেরিকা যুদ্ধে নামায় তারও জাপানকে সন্তুষ্ট করে চলতে হয়েছিল। তাকে ল্যানসিং-ইসায়ি (Lansing-Isaii) বন্দোবস্ত অনুসারে স্বীকার করতে হয়েছিল, চীনে জাপানের বিশেষ স্বার্থ আছে।

যুদ্ধ মিটে গেলে নতুন নতুন কথা জন্মাতে লাগল। আমেরিকার সেনেট সভা জার্ম্মাণীর সঙ্গে সন্ধি স্বীকার করেনি ব'লে ১৯২১ সালে Washington Conferenceএ চীনে জাপানের প্রাধান্য অস্বীকার করে। রুশ ও জর্ম্মানীর ধ্বংস হওয়ায় ভারত হারানর ভয় কমে গেছে বলে, ইংরাজও জাপানের সঙ্গে সখ্যের আর আবশ্যকতা বোধ করে না। বরং ইংরাজ জাপানকে শত্রু-স্থলাভিষিক্ত করে। ইংরাজ সাম্রাজ্য সে ধ্বংস করতে পারে, তাই আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব লাভজনক হবে। ফলে এই দাঁড়াল, —এক দিকে হল তখনকার মত ইংরাজ ও আমেরিকা—অন্যদিকে ফ্রান্স ও জাপান। স্বার্থে স্বার্থে আঘাত লাগায় ইংরেজ আমেরিকায় এখন মন-কষাকষি হয়েছে। একটা মিটমাটের চেষ্টাও

চলছে। চীনও এখন জেগে উঠেছে, সাবলম্বন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব তার ভিতর ফুটে উঠেছে। এই নব জাগরণের ভয়ে ইংরাজ সিঙ্গাপুরে নৌ-বহরের আড্ডা করতে চায়। এদিকে ১৯২৪ সালে ফরাসী জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক মৈত্রী স্থাপন করেছে। আবার এই বছরে আমেরিকা Immigration Bill করে জাপানকে অপমান করায় বিপদপাতের সম্ভাবনা বাড়ল। সিঙ্গাপুরে আড্ডা করলে জাপান-চীনকে ঠেকাবার উপায় যেমন হবে, তেমনি ফরাসী উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য—আনাম, টংকিং, ক্যাম্বোডিয়া বেকায়দায় পড়বে। জার্ম্মানীর ধ্বংসের পর ফরাসী এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সামরিক জাতি। তাই ইংরেজের এই চোখ-টাটানি। ইংরাজের চীন-ভীতি জাপান-ভীতির অনুরূপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে দেশে গুজরানের অসুবিধা বেড়েই চলেছে বলে জার্ম্মাণী সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির আশায় ফেসাদ বাঁধিয়ে বসেছিল। ঠিক এই কারণ চীন ও জাপানের পক্ষে খাটে। সম্প্রসারণ করতে গিয়ে তাদের সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হতে হবে। রণচাতুর্য্যের দুটো অংশ—একটা হচ্ছে Diplomacy বা কুটনীতির আশ্রয়ে কাজ গোছান, অপরটা প্রকৃত বধাবধি। প্রথমটা বন্ধুভাবে বা ভদ্রভাবে করা হয়, এর নাম Peaceful penetration—শান্তির আবরণে প্রতিপক্ষের আস্তানায় প্রবেশ লাভ। তারপর সময় বুঝে নিজমূর্ত্তি ধারণ। ইংরাজ ত এই ভাবে ভারত অধিকার করেছে। ব্যবসা-ধর্ম্ম প্রচার থেকে লাফ মেরে রাজ-পাট দখল। মালয় উপদ্বীপে, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে ঐ রকম শাস্ত পেশা

উপলক্ষে চীনা বংশ বৃদ্ধি করে সমগ্র লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশে দাঁড়িয়েছে। এদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও কম নয়। সুদিন গিয়ে ইংরাজের কুদিন যখন আসবে, তখন এদের সাহায্যে চীন যে কত রকম সুবিধা করে নেবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সেই অনাগত দিনের চিন্তায় ইংরাজ অস্থির।

নানাদিক দেখে প্রসিদ্ধ জাপানী এডমিরেল টোগো, রুশ-জাপান যুদ্ধে নেলসনের মত যিনি জাপানের মান রেখে ধনে-প্রাণে বাড়িয়েছেন—ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন, পৃথিবীর আগামী মহাযুদ্ধ প্রাচ্য ভূখণ্ডে আরব্ধ হবে। এটা একটা ফেলনা কথা নয়! সত্যি কথা বলতে গেলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতের এমন কতকগুলি মুসলমান আছেন, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক আছেন, যাঁরা ভারতে মুসলমান-রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান। এমন কি আফগান-রাজ্যের বিস্তার এখানে হলে শুধু খুসী নন, বেঁচে যান। আফগানও একথা বুঝে। সেও গোলমালের সময় ঝোপ বুঝে কোপ মারতে কসুর করবে না।

পারস্য, তুর্কী ও আফগানে মিলে ইসলাম-গৌরব বিস্তারের জন্য সমবায় গড়ে তুলতে দেরী করলেও ইংরাজের বিপদের সময় আপন আপন রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা যে দেখবে—তার আর সন্দেহ নাই। সেই জন্যও ভারতে মুসলমান চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত না হয়ে পারে না। আগে যা বলা হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ইংরাজের শত্রু আজ পৃথিবী-জোড়া। তাকে বেকায়দা করা অনেকের স্বার্থ বা প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থতার সুযোগ।

পৃথিবীতে যে সবচেয়ে বড় হয়, তার হিংসা করে অনেকে। তার উপর যদি তার স্বকৃত কার্য্যের জন্য শত্রু গোপনে বা প্রকাশ্যে বেড়ে থাকে, তারা তার মাথা নীচু করার চেষ্টায় সব করতে পারে। ইংরাজ গত যুদ্ধের লাভে লাভবান হওয়ার পর তার আজ এই অবস্থা। দুর্দ্দৈব যে তাকে ঘিরে ধরেছে, তার আর কোন ভুল নাই।

সত্যি বা মিথ্যে দিয়ে হ'ক, স্বার্থ বা প্রতিশোধের স্পৃহায় বা ঈর্ষায় ইংরাজকে চূর্ণ করার ষড়যন্ত্র ছোট-বড়-মাঝারি শক্তিদের মধ্যে হবে। প্রাচ্যে ভারতের বলে ইংরাজের বল। তাকে চালমাত করার জন্য ভারতের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে কতকগুলি কাজ তারা করবে। আর ইংরাজকে ব্যতিব্যস্ত করার জন্য ভারত-আক্রমণ কয়েক দিক থেকে করতে পারে—যেমন ভারতের আয়-ব্যয়ের পথ বন্ধ করার জন্য সমুদ্র-পথে তার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া। শুধু তা নয়, তার সমুদ্র উপকূলের বন্দরগুলি ধ্বংস করার চেষ্টা করা হবে। এমনি বহির্ব্বানিজ্যের কথা ছেড়ে দিলেও তার এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে কোন জাহাজ যাতায়াত করতে না পারে, সে চেষ্টা তারা করবে। বিগত যুদ্ধে জর্ম্মাণ জাহাজ 'এমডেন' একা যা করেছে, তা থেকে আমাদের এ আশঙ্কা করা ভুল হবে না।

এই সঙ্গে একটা কথা বলে রাখা দরকার। নতুন যুদ্ধে নতুন প্রক্রিয়া চলা সম্ভব। কাজেই মনে হয় বিষাক্ত বাষ্প, সাবমেরিণ ও এরোপ্লেনের যুদ্ধ এসে জলে-স্থলে এক নতুন রকমের মহামারী

দেখিয়ে দেবে। এ অবস্থায় সুবুদ্ধিতে যদি ভারতবাসীকে সরলভাবে, প্রাণ খুলে সামরিক বিভাগে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে যোগ্য ভার দেওয়া হয়, ও যদি Army, Navy, Aerial fleetএ তাকে স্বাবলম্বন দেওয়া হয়, তবে রক্ষা। নইলে ইংরাজকে আমাদের বলতে হবে—'আপনি মজিলি ভাই, লঙ্কা মজাইলি।' ব্যাপারটা ভাল ক'রে বোঝার জন্য পরে বিশদ আলোচনা করব।

ভয়ের পথের খসড়া

অবলা কেন মা এত বলে ? একথাটা ভারতের পক্ষে অক্ষরে অক্ষরে খাটে। ভারতের প্রাকৃতিক বৈভব, দ্রব্য-সম্ভার, লোকবল, অর্থবল গত মহাযুদ্ধে ইয়ুরোপকে জার্মানের কবল থেকে বাঁচিয়েছে। মার্ণের যুদ্ধে একটি একটি ক'রে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি ভারতের সেনা না মরত, আজ যুদ্ধের ইতিহাস তা'হলে অন্য কথা লিখত ! আফ্রিকার জার্ম্মান-উপনিবেশ ভারত-সৈন্য কেড়ে নেয়। মিশর, প্যালেষ্টাইন, মেসোপটেমিয়ায় ভারতের বাহুবল তুর্কিকে ধ্বংস ক'রে বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করে। অথচ সেই ভারত পরপদানত ত বটেই,এমন কি যুদ্ধের সময় সাগর-জোড়া ইংরাজের নৌবহর তাকে জলপথে 'এমডেনের' আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারেনি। ১৯১৯ সালে আফগান যুদ্ধাভিযান ক'রে একটা ভীতির

সঞ্চার করতে পরাস্ত হয়নি। ১৮৮৫ সালে রুশ ভারত আক্রমণ করবে এ আশঙ্কা যেমন প্রবল হয়েছিল, আজও জলে বা স্থলে ভারত-আক্রমণের সম্ভাবনা তার চেয়ে একটুও কমে নাই। 'এমডেন' ও আফগানের কৃত ক্ষতি অপেক্ষাকৃত সামান্য হ'লেও একটা বিষয়ে জগতবাসীর চোখ খুলে দিয়েছ। ইংরাজের শৌর্য্য-বীর্য্যের উপর আমাদের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার আছে ভেবে সুস্থিরচিত্তে নিদ্রা যাবার ভ্রমটা অন্ততঃ ভেঙ্গে গেছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত ১৪০০ মাইল লম্বা; স্থানে স্থানে দুর্দ্ধর্ষ সমর-কুশল লুঠ-তরাজ-প্রিয় ধর্ম্মান্ধ জাতের বাস। কোথাও বা অসভ্য বর্ব্বরের আড্ডা। গভীর বন-জঙ্গল সমাচ্ছন্ন দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের অনেক জায়গা এমন আছে যে, সেখান থেকে সমতল ভূমির অধিবাসীদের অস্থির করে তোলা আদৌ অসম্ভব নয়। তার উপর সমুদ্রের উপকূল ৬০০০ মাইল। এতখানি জায়গা সুরক্ষিত রাখাও সোজা নয়। তাই আমরা আলোচনায় আনব—

(১) সমুদ্র-পথের বিপদ-আপদের কথা।
(২) উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত।
(৩) আফগান সমস্যা।

সমুদ্র-পথের ভয়

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মান-আতঙ্ক ইয়ুরোপের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল। সে জন্য Anglo-Japanese Alliance করে', প্রাচ্যের তত্ত্বাবধানের ভার জাপানের কাঁধে চাপিয়ে ইংলণ্ডের নৌ-বহর পাশ্চাত্য নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আজ আর সে কথা নাই। সম্বন্ধটা বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে। জার্ম্মান-ভয় গিয়ে জাপান-ভীতি সে জায়গা অধিকার করে বসেছে। Washington Conferenceএ অস্ত্র-শস্ত্রের সংখ্যার সীমা নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়ায়, রণনীতির কৌশল অনুযায়ী জলযুদ্ধের বেবাক ভারটা মোটামুটি প্রাচী ও প্রশান্ত উপকূলের দিকে এসে পড়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে ভারত প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংযোগ-পথের পাশে দাঁড়িয়ে উত্তর দিক থেকে বেশ একটা

কায়দার ভাবে আছে। সুতরাং সরাসরি ভাবে কোন জাতি যদি নৌ-পথে ভারত আক্রমণ করতে চায়, তাহলে তার অসুবিধা এই হবে যে, সে তার Base বা প্রধান আড্ডা থেকে অনেক দূরে ছিটুকে পড়বে। এ অসুবিধে ছাড়া কেমন ক'রে ভাবী শত্রু আক্রমণ কর্ত্তে পারে, তাই নেড়ে চেড়ে দেখা যাক্। প্রতীচীর শত্রুর রণতরীকে হয় সুয়েজ খাল দিয়ে আসতে হবে, নয়ত আফ্রিকা বেড়ে আসতে হবে। ইংরাজ পরাক্রান্ত থাকতে সুয়েজের সুরক্ষিত পথে কারুর খোলাখুলি ভাবে আসা সম্ভব নয়। আফ্রিকার ঘোরা-পথে আসতে হলে যে সময় যাবে, base থেকে দূরে পড়ায় যোগান পাবার যে বে-বন্দোবস্ত হ'য়ে পড়বে, তাতে চেপে লড়াই চালান যায় না। তা' ছাড়া তারা পৌঁছিবার আগে সুয়েজের সোজাপথে ইংলণ্ডের রণতরী ভারত রক্ষার জন্য এসে জমাটি করে নেবে। সুতরাং ওদিক থেকে ভয় নেই বল্লেই হয়। প্রাচী থেকে আক্রমণটা অপেক্ষাকৃত সোজা। সিঙ্গাপুরের সন্নিহিত মালাক্কা প্রণালী দিয়ে শত্রু-রণতরী এসে ভারত আক্রমণ করতে পারে। এর ওপর যদি সিঙ্গাপুর সুরক্ষিত হয়, আর দার্দ্দানেলের মত মালাক্কা প্রণালী সুসজ্জিত হয়, তাহলে ও-পথে ছুঁচ অবধি গলতে পারবে না। আর যদি ও ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে আসতে চায়, তাকে অষ্ট্রেলিয়া বেড়ে আরও পূব দিক দিয়ে ঘুরে আসতে হবে। তা করতে গেলে তাকে আড্ডা (base) থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। সুবিধা হবে না। এখানে দুটো কথা খোলসা ক'রে বলা দরকার। রণ-নৈপুণ্যে Strategy আর Tactics ব্যবহার হয়। একটা হচ্ছে সৈন্য-সামন্ত সমাবেশ বা পরিচালনা

সংক্রান্ত ব্যাপার, আর একটা কায়দার মার বা কাবু করার জায়গা সংক্রান্ত বিষয়। এর থেকে যুতমত মার দেওয়া চলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—Tactics হচ্ছে সামনে থেকে মারার চেয়ে পার্শ্ব থেকে মারা বেশী ফলপ্রদ। সাম্‌না-সাম্‌নি লড়াইয়ে (frontal attack) শোধবোধ হতে পারে। কিন্তু পাশ থেকে মারায় (Flanking attack) শত্রু ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সেই জন্য শেষোক্ত রকমের কায়দা বেশী ভয়াবহ। বিগত মার্ণের যুদ্ধে ফরাসী-সেনাপতি জোফ্রে এই বুদ্ধি অবলম্বন করেছিলেন। Strategy হচ্ছে সৈন্যদের এমন অবস্থান বা সঞ্চালন যে নিজেরা সুরক্ষিত থেকে শত্রুকে ফাঁকা অবস্থায় পেয়ে মারবে। এই সুরক্ষিতের অন্তর্গত হচ্ছে আচ্ছাদন ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার সুবন্দোবস্ত। রসদ—Commisariat ছাড়া কোন বাহিনী এক পাও চলতে পারে না। সেই দরকারী রসদ-পত্তর, গুলি-গোলা, অস্ত্র-শস্ত্র, পোষাক-আসাক, চিকিৎসা প্রভৃতির সুব্যবস্থার জন্য বিশিষ্টভাবে ব্যবস্থাপিত স্থানকে Base বলে। এখানে সরবরাহের নানা রকমের Depot থাকে। সুতরাং Base থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দূরে গিয়ে পড়লে সব অগোছ হয়ে যায়। তাতে যুদ্ধ ত চলেই না, পরাজয় অনেক সময় টেনে আনা হয়। নেপোলিয়নের আগে সৈন্য চালনার সময় Supply from Depot এই নিয়ম ছিল। তার অসুবিধে এই যে রুখে গিয়ে সুযোগমত বেশী এগিয়ে যে লাভ হয়, সেটা সময় সময় হজম করা যায় না। Napoleon করলেন Supply from locally available store। শত্রুর জায়গা দখল করে সেখানে যা আয়ত্ত

করা যাবে তাতেও যোগান চলবে। এই ভাবে চলে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এতে ডিপোর (Depot) উপর নির্ভর খুব কমে গেল। ডিপো (Depot) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্কো অভিযান কালে, রুশিয়ানরা সব উদ্বৃত্ত আহার্য্য পুড়িয়ে দেওয়ায় তাঁর সেনাদলের সর্ব্বনাশ হয়ে যায়। তিন লক্ষের মধ্যে অধিকাংশ মারা যায়। সেই শিক্ষায় এখন হয়েছে Supply from Depot and from locally available store. Tactical point বা groundএর দৃষ্টান্তও আলোচনা করা যাক্। কায়দার জায়গা তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণীর—জল ও স্থলপথের সংযোগ-স্থান। তা'তে থাকবে আহার্য্যের প্রাচুর্য্য। সৈন্য ও দ্রব্য-সম্ভার দ্রুত চলাচলের যান-বাহনের সাধারণ সুবিধা। Constantinople এই হিসাবে আদর্শস্থানীয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পথে পাহারা রাখার স্থান এমন আর নাই। Napoleon একে বলতেন key to the world অর্থাৎ যে প্রতিভাশালী সেনানীর হাতে এ জায়গা পড়বে, সে জগত জয় করতে পারবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর—শুধু স্থলপথ বা জলপথের সংযোগ-স্থল। যেমন মালক্কা প্রণালী, বর্ম্মা, আফগানিস্থান।

তৃতীয় শ্রেণীর—আংশিকভাবে ঐ সকল লক্ষণ যেখানে যেখানে মেলে।

এই ক'টা বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি রেখে আমাদের ভারতের মান-চিত্র পাঠ করতে হবে। তাহ'লে শত্রুর ভাবী গতিবিধি বা বদমায়েসী চাল ধরতে পারব। তারপর যা' বলছিলাম।

সিঙ্গাপুরে আঁটঘাঁট বাঁধলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হবার কথা। অবশ্য সে নিশ্চিন্ত দু'জনের কাছে—দু'রকমের। ইংরাজের কাছে তার মানে নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগের কাল-বৃদ্ধি। ভারতের কাছে তাই হবে বোতলের ভিতর ছিপি-আঁটা হয়ে মার খাওয়ার লম্বা লম্বা দিন গণনার অপ্রীতিকর অবস্থা। তেমনি লঙ্কাদ্বীপেও একটি ঘাঁটি বসালে 'অধিকন্তু ন দোষায়' হয়। তা ছাড়া ভারতের নিজের একটি নৌ-বহর থাকা দরকার। কারণ ভারতের কল কারখানার শিল্প যে অবস্থায় আছে, তাতে তাকে বিদেশের আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়; যুদ্ধের সময় তার চেয়ে বেশী করতে হবে। কেন না যুদ্ধের উপকরণ অধিকাংশ বাইরে থেকে আনতে হয়। আর যাও সে এখানে তৈরী করতে পারে, তার অনেক উপাদান বিদেশ থেকে আনতে হয়। তা ছাড়া তার যা সৈন্য এখন আছে, তা নিয়ে এতবড় দেশের সর্ব্ব প্রবেশ-পথ রোধ করে রাখা তার সম্ভব নয়। মাইনে-করা-সেপাই ভারতের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় এর বেশী বাড়ানও অসম্ভব। তার National militia নাই। কাজেই বিদেশ থেকে সাহায্য তাকে আনতেই হবে। ভারত যদি অবাধে তার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করতে পায়, যদি নিজের পায় দাঁড়াবার জন্য নিজের-তৈরী সাজ-সজ্জায়-সাজান National militia গড়তে পায় তা হলে অবশ্য অনেকটা সুরাহা হবে। বর্ত্তমান অবস্থায় সমুদ্রে যাতায়াতের সুবিধা তাকে রক্ষা করতেই হবে। তা সে জলেই লড়ুক, আর স্থলেই লড়ুক।

এ থেকে এই দাঁড়াচ্ছে যে, ইংলণ্ডের নৌ-বহর যদি ইয়ুরোপের

কোন শক্তির শত্রুতা নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, আর এদিকে প্রশান্ত সাগর থেকে ভারত সাগর হ'য়ে কেউ দয়া করে এসে এদেশে হানা দেয়, তা হলে ব্যাপারটা বড় গুরুতর হবে।

মোটামুটি বোঝা যায় আমেরিকা ইংরাজের সহায় হলে আটলান্টিক, ভূমধ্য, ভারত ও প্রশান্ত সাগর থেকে বড় রকমের গুঁতো ভারতে পৌছবে না। কিন্তু মাঝারি ও ছোট খাট চোট যে অনেক লাগতে পারে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। সময়গুণে আদত অবস্থাটা উল্টে যাবার দাখিল হয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ এখন কল্পনার বৈঠক ছে'ড়ে বাস্তবক্ষেত্রে স্থান ক'রে নেবার মত হয়েছে। মর্গ্যান কোম্পানীর কাছে ইংরেজের টিকি বাঁধা। সে কোম্পানী মার্কিণ। লণ্ডন-ব্যাঙ্ক এখন আর অর্থনৈতিক জগৎ পরিচালনা করে না, সে কাজ করে নিউইয়র্ক-ব্যাঙ্ক। সমুদ্র-পথের স্বাধীনতা চায় মার্কিণ। ইংরেজ তার আধিপত্য ছাড়তে নারাজ। কাজেই মনান্তর। যেমন ধরা যাক লুটতরাজের কাণ্ড। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচি প্রভৃতি বন্দরের আশে পাশে মাইন ছেড়ে দেওয়া; ডুবো-জাহাজের কারসাজি; তার সঙ্গে বোমা মারার উড়ো-জাহাজও থাকতে পারে। শত্রুরা এরকম একটা চেষ্টায় তাদের অনেক দিক থেকে লাভের আশা করতে পারে। ভারতের ৬০০০ মাইল লম্বা উপকূল সর্ব্ব অংশে আগলে বেড়ান চলে না। তার ছোটখাট পোতাশ্রয় (Harbour) থেকে শত্রুরা চেষ্টা করলে বে-আইনি ভাবে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগাড় কিছু স্থায়ীভাবে করে নিতে পারে। বুদ্ধি খাটিয়ে খাদ্য যোগানের আড্ডা করলে লাক্ষা দ্বীপ, মালদ্বীপ,

নিকোবর দ্বীপ থেকে অলক্ষিতভাবে কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

ও রকম কাজে শত্রুর চিত্ত-বিভ্রম ঘটান যেতে পারে। তা'তে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচি, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, বেসিন, মোলমিন, একিয়াব, মারগুই, নেগাপটম, মসলিপটম, ভিজগাপটমের মত বন্দরগুলির খুব ক্ষতি করা হবে। আজকাল-কার যুদ্ধে শত্রুর অর্থনৈতিক ক্ষতি করাটাও রণ-কৌশলের একটা বিশেষ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শত্রুর ব্যবসা-জাহাজ, যুদ্ধোপ-করণ ঐ ভাবে নষ্ট করা চল্‌বে। ১৯১৪ সালে 'এমডেন' ও পথ দেখিয়েছে। ১৯১৭ সালে বোম্বাইএর ধারে শত্রুপক্ষ গোপনে যে মাইন বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তাতে ইংরাজের বহুমূল্য কতকগুলি জাহাজ মালপত্র শুদ্ধ নষ্ট হয়েছিল। সুতরাং ভবিষ্যতে ভারতের আশে-পাশে ও রকম লুট-তরাজ, লোকসানী কাণ্ড ঘটবে। তারপর আসল কথা। ভবিষ্যত যুদ্ধে ভারত ও ভারতেতর দেশে সৈন্যদের জাহাজ চড়িয়ে এখানে ওখানে নিয়ে যাওয়া-আসা করা দরকার হবে। তাদের জাহাজ মারা সর্ব্বদা শত্রুদের লক্ষ্য থাকবে। এটার দরকার সৈন্যদের মারার বিষয় যেমন, জাহাজ চলাচল দুর্ঘট ক'রে ভারত-সৈন্যদের আটকে অকেজো করে রাখাটাও তেমনি; অর্থাৎ গত যুদ্ধের মত ভারতীয় সৈন্য যেন বাইরে গিয়ে ইংরাজকে সাহায্য করতে না পারে। তা ছাড়া ও রকম খণ্ড-যুদ্ধে যে লোকের মনে ভয়, চিন্তা, নিরাশা, উদ্‌ভ্রান্ত ভাবের ছাপ পড়বে, সেটার দামও কম নয়। এক 'এমডেনের' ঠেলায় কি আতঙ্কের সৃষ্টিই না করেছিল! ঐ রকম আক্রমণের সঙ্গে যদি

ভাঙ্গায় ভয়াবহ মত প্রচার (Propaganda) করা হয় তা' হ'লে স্থানীয় যে সমস্ত গোলযোগ, অশান্তি, আইন-ভঙ্গের সৃষ্টি হবে, তা নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ব্যস্ত হলে বেশী দরকারী কাজের বহুল ক্ষতি হবে। শুধু তা' নয়, অন্তর্বিপ্লব ঘটাও কিছু আশ্চর্য্য নয়। সুতরাং যা বলা হয়েছে, তা থেকে এই বোঝাচ্ছে যে, আত্মরক্ষার জন্য ভারতকে সমুদ্র-পথে যা করতে হবে তা হচ্চে এই—

(১) সমুদ্র-পথে খবরাখবরের উপায়গুলির সংরক্ষণ

(২) বন্দরগুলির ও উপকূলের সংরক্ষণ,

(৩) নৌ-বহরের যোগান-দেওয়া আড্ডা গঠন, পোত-মেরামতির কারখানা, কয়লা প্রভৃতির গুদাম স্থাপন ইত্যাদি।

প্রথমটি করতে হলে ভারতে অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা শোনার আগে কিছু দূরে যেন প্রথম রক্তপাত হয়। এজন্য তার দ্রুতগামী যুদ্ধের জাহাজ কয়েকখানি থাকা চাই। তাতে যতদূর সম্ভব ভারতীয় নাবিক-সৈন্য রাখা উচিত। কেননা নিজের দেশের জন্য ভারতীয়েরা যেমন লড়বে, ভাড়াটেরা তেমন পারবে না। কিন্তু এ পথে আমাদের এখন প্রবেশাধিকার নেই। রণনীতি অনুসারে ঘরে লড়াই হ'তে না দিয়ে যাতে বাইরে লড়ার প্রথম সুযোগ পাওয়া যায়, তেমনভাবে সৈন্য-সমাবেশ করা দরকার। ঘাঁটি আগিয়ে রাখা (Advanced Post) এইজন্য দরকার। সৈন্য-চালনার সময় জলে বা স্থলে সৈন্যসংখ্যাকে তিন ভাগ করতে হয়। অল্প-সংখ্যক আগে আগে যায়, তাদের নাম Advanced Guard বা মওড়ার দল; মাঝে থাকে Main Body বা আদত দল, সব পেছনে থাকে Rear Guard বা পশ্চাৎ-রক্ষক। আদত দলের

দু'পাশে থাকে রক্ষী-সৈন্য। এরা পরস্পর থেকে কিছু কিছু দূরে থাকে। আগের দল শত্রু কোথায় আছে, কি ভাবে, কত সংখ্যায়, কেমন ঠাটে আছে সে সংবাদ দেয়। আবার গুপ্তভাবে অবস্থিত শত্রুকে প্রলুব্ধ ক'রে আক্রমণে আনায় আদত-দল সতর্ক হয়ে যায়। পিছুর দল দেখে কেউ পেছন থেকে এসে আদত দলের মাথায় না বাড়ি দেয়। এ ছাড়া রসদ, যান-বাহন, যুদ্ধোপ-করণ, খবরাখবরের উপায় ও হাঁসপাতাল রক্ষা করে। পিছু হটতে হলে মওড়ার দলের মত কর্ত্তব্য এদের করতে হয়। আমাদের দেশরক্ষায় জন্য Advanced Post এর দরকার, আর নৌ-বহরের ভাগাভাগিও দরকার। আমাদের যা Royal Indian Marine (একটু বদলে নিয়ে বর্ত্তমানে একে ভারতীয় নৌ-বহর আখ্যা দেওয়া হয়েছে।) আছে,তাতে যুদ্ধ চলেনা। তার আসল কাজ হচ্ছে সৈন্য নাড়ানাড়ি করা, বন্দরগুলির হেপাজত করা, আর সমুদ্র-পথ জরিপ করা।

যুদ্ধে দুটো নীতি অনুসৃত হয়—

(১) মার খেয়ে মার দেওয়া

(২) Theory of bull shock—তেড়ে কুঁদে গিয়ে গুঁতো মারা।

আমাদের দেশের লোকের শিক্ষার জন্য দু'রকম ব্যবস্থাই করা উচিত। প্রথমটিতে বন্দর সুরক্ষিত করার জাহাজ থাকবে, দ্বিতীয়টিতে এগিয়ে লড়ার যোগাড় করে রাখা হবে। এর সঙ্গে ভারতের বানিজ্য-জাহাজগুলিতে ভাল ভাল কামান আর সুশিক্ষিত গোলন্দাজের ব্যবস্থা করা উচিত। তা হলে

যুদ্ধের সময় সহজে বানিজ্য-জাহাজগুলি যুদ্ধের জাহাজে পরিণত হতে পারবে। ইংলণ্ড ও ভারতের স্বার্থ হচ্ছে যে ভারতের নৌ-বহর যেন তার সৈন্যের মত সবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গৌরব-মণ্ডিত ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে পারে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে

আমরা ঘরের খিল খু'লে ঘুমাব, কি দরজা ভেজিয়ে ঘুমাব, অথবা দরজা বন্ধ ক'রে থাকব, সেটা স্থির করার আগে আশে-পাশে যারা থাকে তাদের কথাটা ভেবে দেখতে হয়। নিরস্ত্র সজ্জায় থাকব, কি সশস্ত্র অবস্থায় সন্ত্রস্ত হ'য়ে দিন কাটাব, তা ঠিক হয়ে যাবে পাড়াপড়শীদের হালচাল দেখলে। এ সম্পর্কে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান, তার দৈর্ঘ্য, বিস্তার, সেখানকার বাসিন্দাদের সবিশেষ বিবরণ, তাদের প্রকৃতি, শক্তি-সামর্থ্য, মানসিক হাবভাব, পথ-ঘাট প্রভৃতি আলোচনা করতে হবে। সেই সঙ্গে তার ওপারে যারা আছে, সেই আফগানদের খবরটাও নিতে হবে। তারপর ঐ জাতিগুলির সঙ্গে কি ভাবে চলা হবে, তা ঠিক করা হবে। আর আফগান ও রুশের প্রভাব, প্রতিপত্তি,

লীলাখেলা অবলম্বনে অবস্থার গুরুত্বও উপলব্ধি ক'রে পথ নির্ণয় করা যাবে।

আমাদের সীমান্ত :—কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে জিলগিট ছাড়িয়ে যে সামরিক ঘাঁটিগুলি আছে, সেখান থেকে আরম্ভ ক'রে আরব সাগরের উপকূলস্থ বেলুচিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত মাকরাণের পার্ব্বত্য পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লম্বায় এটি ১৪০০ মাইল হ'বে। এর একবারে উত্তরাংশ হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের কোলাকুলির ভিতর মিশে গেছে। তারপর মোটামুটি দক্ষিণ-পশ্চিম রোখ নিয়ে সুলেমান পর্ব্বতের ধার ঘেঁসে বেলুচিস্তানের উত্তরে অবস্থিত মুস্কি পর্য্যন্ত গেছে, সেখান থেকে পশ্চিম মুখে চ'লে প্রায় ৩৫০ মাইল আফগানিস্তানের দক্ষিণ কিনারা দিয়ে কোহি-মালিক-সিয়া গিয়ে থেমেছে। এইখানে পারস্য, ভারত ও আফগানিস্তানের সীমানা এসে মিলেছে। এখান থেকে দক্ষিণ-মুখো বেলুচিস্তানের অনুর্ব্বর মরুময় পাঁজগড় ও মাকরণ জেলার ভিতর দিয়ে আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে। দক্ষিণে প্রায় ৪০০ মাইল বাদ দিলে বাকিটা সব পাহাড়-পর্ব্বতের ভিতর পড়ে—এরই মাঝে মাঝে সঙ্কীর্ণ, উর্ব্বর জমিজমা যা কিছু আছে। সুতরাং এই পাহাড়ে বেড়া দিয়ে আফগানিস্তান থেকে ভারতকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এই বেড়ার উত্তরের ৩০০—৪০০ মাইল দুর্গম পাহাড়ে ছাওয়া। এখান দিয়ে বড় গোছের বাহিনী নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। শুধু তাই নয়, খুব গরমের সময় ছাড়া অল্পসংখ্যক সৈন্য চালনা করাও চলতে পারে না। কাজেই আমাদের সীমান্তের উত্তর ও দক্ষিণ অংশ দিয়ে আক্রান্ত হবার

ভয় নাই। দক্ষিণ মাকরাণ থেকে কোহি-মালিক-সিয়া হ'য়ে মুস্কি পর্য্যন্ত এমন জলাভাব, পথাভাব, মরুবিস্তীর্ণ জায়গা যে সেদিক দিয়ে চিন্তার কারণ নাই। অবশ্য সেকালে মুস্কি থেকে কোহি-মালিক-সিয়া পর্য্যন্ত বানিজ্যের একটা পথ ছিল। আজ-কাল রেল করা হয়েছে। ঠিকমত ধরতে গেলে মরু-প্রদেশ বাদ দিয়ে কাজের জায়গা হচ্ছে কোয়েটা। সেখানে ইংরাজের যথেষ্ট সৈন্য সন্নিবেশিত আছে। যা কিছু ভয় মধ্যভাগ থেকে।

এই যে সীমা নির্দ্দেশ করা হল, এটাকে Durand line বলে; প্রকৃতই এতটা পর্য্যন্ত ইংরাজের সাক্ষাৎ শাসনাধীন নয়। * উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের প্রকৃত শাসনাধীনে জেলাগুলি (পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু, ইসমাল খাঁ) থেকে অনেকখানি যায়গা সোয়াটি, ওয়াজির, বায়জার, আফ্রিদি, মোমান্দ প্রভৃতি স্বাধীন জাতির বাস। তারা না ইংরাজকে খাজনা দেয়, না কাবুলরাজকে খাজনা দেয়। ৩৯০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে ইংরাজা-ধিকারে আছে ১৩৫০০ বর্গ মাইল। যাই হ'ক, সীমান্তের

* (N. Agencies of the frontier—পেশোয়ার, বান্নু, কোহাট, ডেরা ইসমাইল খাঁ, হাজারা এই শাসিত জেলাগুলি থেকে আফগানিস্থানে কতগুলি পার্ব্বত্য জাতি উপদ্রবের পর উপদ্রব করায় ডির, সোয়াট, চিত্রাল, খাইবার, কুরাম, তোচি এবং ওয়ানায় (Dir, Swat Chitral, Khyber, Kurram, Tochi ও Wana) এজেন্সী স্থাপন ক'রে, ইংরাজ এজেন্সী অফিসার মোতায়েন করে' এই সব জাতকে সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ ক'রে চালাবার বন্দোবস্ত করেছে। সীমান্ত-প্রদেশের চীফ কমিশনারের সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। ইনি এদের পক্ষে বড়লাটের প্রতিনিধি।)

মাঝামাঝি ভাগটা, উত্তরে বাজৌর থেকে দক্ষিণে সরাবক পর্য্যন্ত ৬০০ মাইল ভয়ের যায়গা। এই অংশে স্থলেমানি পর্ব্বত ভেদ ক'রে হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের মত পূবে-পশ্চিমে পাঁচটা পথ নদীর গতি ধ'রে ইংরাজ রাজত্ব থেকে আফগানিস্তানের দিকে গেছে। এ সব পথ দিয়ে সৈন্য-সঞ্চালন করা সম্ভব। এদের মাঝে মাঝে যে সব জায়গা আছে, সেগুলি Lateral Communication—সংযোজকের কাজ করে। তাদের ভিতর দিয়ে বড় বাহিনী নিয়ে যাওয়া যায়না।

পথ পরিচয় :—

(১) সবচেয়ে উত্তরের পথ পেশোয়ারের নিকটস্থ নওসেরা থেকে চিত্রাল অবধি গেছে। এ পথে সৈন্য-চালনা ততটা স্থবিধাজনক নয়। চিত্রাল থেকে আফগানিস্তান যাতায়াতের কয়েকটি পথ আছে। সেখান দিয়ে সৈন্য-সামন্ত চলতে পারে। শীতকালে বরফ পড়ে বলে', আর দক্ষিণ অংশ অস্থবিধাজনক বলে', ওপথে ভারত-আক্রমণের ভয় নাই বললেই চলে।

(২) খাইবার পাশ। এইটি সবচেয়ে স্থগম পথ। এই পথেই অতীতে বারে বারে ভারত আক্রান্ত হয়েছিল। ভারত-সীমান্তে জামরুদ থেকে আফগান সীমান্ত লাণ্ডিকোটাল ২২ মাইল পথ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। এই পথে মোটর জালালাবাদ হ'য়ে কাবুল পর্য্যন্ত যায়। ভারতের সঙ্গে ব্যবসার জন্য পণ্যদ্রব্য এই পথে আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে। লাণ্ডি-খানা পর্য্যন্ত সম্প্রতি রেল হয়েছে। স্থতরাং এই প্রকাশ্য রাজ-

পথের দরুণ এই জায়গার উন্নতি যথেষ্ট হবে। কাবুল নদীর ধারে ধারে এই রাস্তা চলেছে।

(৩) খাইবারের দক্ষিণে—এর পরেই স্থান হচ্ছে কুরামের পার্ব্বত্য-পথের। কুরাম নদীর উপত্যকায় এই প্রবেশ-পথটি অবস্থিত। কোহাট থেকে একটি মোটরের রাস্তা ও একটী সরু রেল রাস্তা (Narrow gauge line) ৬০ মাইল গিয়ে থাল (Thal) পর্য্যন্ত পৌঁছেছে। থাল থেকে সুন্দর একটি রাস্তা পরাচুনার গিয়াছে। সেখান থেকে পাইওয়ার কোটাল নামক গিরিপথ দিয়ে আফগানিস্তান যাওয়া যায়। শীতকালে এ পথে একটু অসুবিধা। লর্ড রবার্টস্ এই রাস্তায় ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন।

(৪) এর দক্ষিণে তচি। রেল চেপে বানু থেকে চল্লিশ মাইল তচি নদীর উপত্যকা দিয়ে মিরান্‌শা যেতে হয়; সেখান থেকে ২৫ মাইল পথ গিয়ে ডাট্টাখেল যাওয়া যায়। সেখান থেকে দাওয়াতোয় হ'য়ে মধ্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করা যায়। এই গাজনীর রাস্তা। গাজনী বেশ বড় সহর। কাবুল থেকে কান্দাহার যেতে হলে পথে পড়ে গাজনী।

(৫) গোমালপাশ। ডেরা ইসমাইল খাঁর উত্তরে ট্যাঙ্ক (Tank) থেকে আফগান সীমান্তে দোমান্দি পর্য্যন্ত লম্বা। Tank থেকে খাজরিকাচ হ'য়ে উত্তর Beluchistan এর Sandeman পর্য্যন্ত নতুন মোটরপথ হওয়ায় এই জায়গার importance—নামডাক বাড়ল। মধ্য আফগানিস্তান থেকে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা এই পথে খুব চলে। শীতকালে পার্ব্বত্য জাতিরা

এ পথ ধরে গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া সমতল ক্ষেত্রে নিয়ে যায়। গোমালের আশপাশ এমনই দুষ্প্রবেশ্য যে যত গোলমালের আড্ডা এখানে; যত লুঠেরা ও দুর্নীতিপরায়ণ লোক এখানে এসে জটলা করে।

ডেরাগাজী খাঁ থেকে দুটি রাস্তা পাহাড়ে মুলুকের ভিতর দিয়ে উত্তর বেলুচিস্তানে গেছে; বেলুচিস্তানে পৌঁছে অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। এখানকার পাহাড়গুলিও অপেক্ষাকৃত নীচু। এখানের লোকেরা তত যুদ্ধ-প্রিয় নয়। তাদের অস্ত্র-শস্ত্রও অনেকটা সেকেলে। প্রধান পথটি 'রাখী' নদীর ধার দিয়ে গেছে। Fort Munroর বার মাইল পূবের অংশটা একটু কষ্টকর পথ হলেও বাকিটা বেশ সুগম। ডেরা গাজী খাঁ থেকে একটি গরুর গাড়ীর রাস্তা লোরেলাই হ'য়ে কোয়েটার উপর দিয়ে Fort Munro পর্য্যন্ত গেছে। Fort Munroর আট মাইল পশ্চিম থেকে ভারবাহী জন্তুর একটা পথ বেরিয়ে গেছে, আর একটা দিয়ে গাড়ী চলতে পারে। এখান দিয়ে সৈন্যেরা অনায়াসে যেতে পারে। সাধারণতঃ ভারত থেকে বেলুচিস্তানে এই দিক দিয়ে সৈন্যরা যায়। ডেরাগাজী খাঁ থেকে দ্বিতীয় পথটি হারান্দ ও চাচাপাশ হয়ে গেছে। ভারবাহী জন্তুর সাহায্যে মাল-পত্র চালান দেওয়া হয়। এইটি পারস্য ও ভারতের যোগাযোগের পুরাতন পথ।

(৬) যদি ষষ্ঠ অঙ্গুলি কল্পনা করা যায়, তা' হলে সবচেয়ে দক্ষিণের প্রবেশ-পথ হবে বোলানপাশ। এটি সিবি হয়ে, কোয়েটা হ'য়ে দক্ষিণ আফগানিস্তানে গেছে। সিবি উত্তর

বেলুচিস্তানে। সিবির আট মাইল পশ্চিমে বোলান নদীর উপত্যকা দিয়ে পঞ্চাশ মাইল গিয়ে কোয়েটায় পৌঁচেছে। কোয়েটা যে সমতল প্রদেশে আছে, তার ভিতর দিয়ে ৭০ মাইল যাওয়ার পর আর একটা ছোট পার্ব্বত্য পথ পড়ে। সুলেমান পর্ব্বতের উপরিস্থিত Khojak pass এখান থেকে অনুন্নত প্রদেশ দিয়ে চামানে (Chaman) পৌঁছেচে। চামান সমতল ক্ষেত্র। (4000 ft. sea level) এই হ'ল কান্দাহারের প্রবেশ দ্বার। কান্দাহার দক্ষিণ আফগানিস্তানের মর্ম্মস্থল। সিবি থেকে চামান পর্য্যন্ত রেল ও মটর পথ আছে। পূর্ব্বে মারি জাতির বড় উৎপাত ছিল। এখন এরা বশ্যতা স্বীকার করেছে। আফগানিস্তানকে বে-কায়দা করার এই প্রকৃষ্ট পথ। প্রথম আফগান যুদ্ধে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজবাহিনী এই পথে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে তৃতীয় আফগান যুদ্ধে এই পথে গিয়ে কান্দাহার জয় করা হয়। ১৮৮৫ অব্দে পেঁজদা—আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম, রুশ কর্ত্তৃক সহসা অধিকৃত হওয়ায় ভারত আক্রমণের ভয় হয়। সে সময় এইদিকে ইংরাজের রণোদ্যোগের হুড়াহুড়ি দেখা যায়। ১৯১৯ সালে তৃতীয় আফগান যুদ্ধের সময় এখানটায় খুব মনোযোগ দেওয়া হ'য়েছিল।

সিন্ধুনদ থেকে পর্ব্বতের নিকট পর্য্যন্ত যত ভূখণ্ড কালাবাগের কাছে একেবারে সরু, আবার সিবির কাছে প্রায় দু'শ মাইল চওড়া। কালাবাগ পাঞ্জাবে মিয়ানওয়ালী জেলায়—বান্নুর পথে। এসব চাষবাসহীন অনাবৃষ্টির দেশে গ্রীষ্মকালে ১৪৩° ডিগ্রি তাপ হয়।

লোক রহস্য :—প্রকৃতির দুর্দ্ধর্ষতার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বাঁচতে হয় বলে এখানকার লোকেরা খুব কষ্টসহ, পরিশ্রমী, নির্ভীক, দুঃসাহসী, যুদ্ধপ্রিয় ও লুটতরাজ-রত।

লোকেরা অধিকাংশই পাঠান। ধর্ম্মান্ধতার জন্য এরা প্রসিদ্ধ। সোয়াটের লোকেরা, আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যে গ্রীকরা এসে রয়ে গিয়েছিল, তাদের বংশধর। বেলুচিরা মুসলমান হ'লেও পাঠান নয়—পারসিক ও কাফ্রি সংমিশ্রনে উৎপন্ন। ব্রাহুই বলে বেলুচিস্তানে যে জাতটা আছে তারা দ্রাবিড়ী।

সমাজ :—কতগুলি উপজাতি আছে তাদের ভিতর গোষ্ঠি ভাগ ভাগ করা। যুদ্ধের সময় উপজাতিগুলি মিলে যুদ্ধ চালায়।

শাসন-প্রণালী :—স্বৈর-তন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র, সাধারণ-তন্ত্র, (Dictatorship, Oligarchy, Republic) এ সব রকমই আছে। মোটের উপর জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধেরা মিলিত হ'য়ে যা করে তাই হয়। এরূপ সম্মেলনের নাম 'জির্গাহ্'। ব্যক্তি-গত স্বাধীনতা এদের মধ্যে খুব প্রবল।

চরিত্র :—গোঁড়া, অন্ধ-বিশ্বাসীদের মোল্লা যা' বলে তাই মেনে চলে। শাস্ত্র-টাস্ত্র অত মিলিয়ে কেউ দেখে না। অজ্ঞতাও খুব বেশী। অ-মুসলমানের উপর আক্রোশ বেজায়। ধর্ম্মের নামে এদের দিয়ে যা' ইচ্ছা করান যায়। বিশ্বাসঘাতকতা ও ফন্দিবাজীতে এরা ওস্তাদ। স্বাধীনতার স্পৃহা এত বেশী যে এদের কাছ থেকে খাজনা নিয়ে শাসন করা সোজা নয়। মোগল বাদসারা দস্যু সর্দ্দারদের মারফৎ কিছু আদায় করতেন বটে, কিন্তু তা নিতান্ত যৎকিঞ্চিৎ। তারপর শিখেরা মাঝে

মাঝে সামরিক অভিযান ক'রে কেড়ে বিগড়ে যা আনতে পারতেন, তাই পেতেন। কাবুলের আমীরের পাওনাও তথৈবচ।

আইন :—তলোয়ারের জোর ছাড়া অন্য আইন কেউ তাদের মানাতে পারেনি। যখন তারা ঘা খায় তখন কিছুদিন সমজদারের মত চলে। আবার সুবিধা পেলে পূর্ব্ব বৃত্তি আরম্ভ করে। কোন রকমে যদি শোনে ভারত-সীমান্তে সৈন্য উপস্থিত কম আছে, তা'হলে অমনি কোমর বেঁধে লুটতরাজ আরম্ভ করে দেয়। প্রাকৃতিক অবস্থান সে দেশের এমন যে দুর্ব্বলের স্থান তথায় নাই। প্রকৃতি তাদের সর্ব্বরকমে জানিয়ে দিচ্ছেন 'লড় আর খাও।' ২৪ ঘণ্টায় তারা ৬০ মাইল হেঁটে মেরে দিতে পারে। ঘোড়া পেলে ঐ সময়ের ভিতর ১৫০ মাইল কাবার করতে পারে। যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য পেলে সারাদিন লড়তে পারে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কষ্টসহিষ্ণু জাতের মধ্যে এরা প্রধান। যুদ্ধে বাঘের বিক্রম দেখিয়ে দেয়।

অস্ত্র-শস্ত্র :—আজকাল এদের দেশে কয়েকটা রাইফেল ফ্যাক্টরী হয়েছে। পারস্যের ভিতর দিয়ে বে-আইনীভাবে পাশ্চাত্য দেশ থেকে রাইফেল আমদানী করে। সাবেক বন্দুকও যথেষ্ট আছে। প্রায় দু'লক্ষ বন্দুক এদের হাতে আছে। আর প্রত্যহ নতুন আমদানী করছে।

রণ-কৌশল :—স্বভাবতঃ গেরিলা যুদ্ধ এদের ধাতুগত। Scouting বা গুপ্তচরের কাজে এরা খুব পাকা। তার উপর আজকাল আধুনিক লড়ায়ের তালিম এরা পাচ্ছে ও পেয়েছে।

১৯১৯ সালে ইংরাজের Frontier Militia সদলবলে ভেগে এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে Officer ছিল, কেউ কেউ Instructor ছিল। আফগান-সৈন্যে ভর্ত্তি হ'য়ে শিক্ষা নিয়ে কেউ ফিরেছে। আবার অনেকে তুর্কী ওস্তাদের কাছে শিক্ষা পেয়েছে। পাশ্চাত্য রণনীতি এখন এরা আয়ত্ত ক'রে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। দিনে দিনে ভারতের পক্ষে এরা বড় দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে পড়ছে, এখন এদের তুড়ি দিয়ে হটান আর চলবে না।
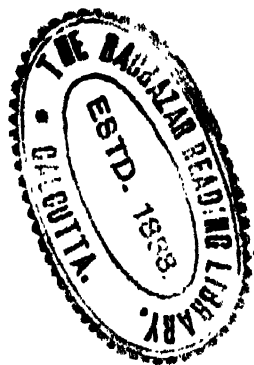
আফগান সমস্যা

এই ত গেল ভারত সীমান্তে পার্ব্বত্য জাতির কথা। এখন আফগানদের কথা আলোচনা করা যাক্। যা'দের সঙ্গে কারবার করতে হবে তাদের চিনে নেওয়া দরকার। রুশের হাত থেকে ভারত রক্ষা করার জন্য এবং দরকার মত ভারতের বাইরে গিয়ে প্রথম আক্রমণে বাধা দেওয়ার ও দেওয়ানোর জন্য ইংরাজ ভারত ও রুশের মধ্যে একটি Buffer State চায়। এই কারচুপি করতে গিয়ে আমাদের ইংরাজ আমলে আফগানের সম্পর্কে আসতে হয়েছে। ১৮০১ সালের কাছাকাছি আমীর জামন শা কয়েকবার ভারত আক্রমণ করে। ওদিকে ফরাসীও ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। এই দুইটিকে উল্টো চাল দেবার জন্য ইংরাজ পারস্যের সঙ্গে সন্ধি করে! কয়েক বৎসর বাদে জামন

শা নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হন। ১৮০৯ সালে রুশও ভারতের সোনার গাছে নাড়া দিয়ে মনিমুক্তা কুড়াবার জন্য ঝুঁকে পড়ে। ইংরাজ বিপদে পড়ে' আফগান ও শিখরাজ রণজিতের সঙ্গে মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন থেকে আফগানিস্তান প্রকৃত Buffer State হ'ল। এই ঘটনার বছর দশ বার পরে একদিকে আফগানিস্তানের ঘরোয়া যুদ্ধ, অন্যদিকে শিখদের পেশোয়ার দখল ও পারসিকদের হিরাট আক্রমণে আমীর দোস্ত মহম্মদ ইংরাজের শরণাপন্ন হন,—বিশেষতঃ রণজিতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। লর্ড অকল্যাণ্ড রণজিতের বিপরীতাচরণ করতে চান নাই। তবে আলেকজাণ্ডার বার্ণসকে দৌত্য দিয়ে কাবুলে পাঠান। ও দিকে বার্ণসের একটু আগে রুষরাজের দূত কাবুলে আসে ও দোস্ত মোহম্মদের সর্ব্ব সর্ত্তে রাজী হয়। বার্ণস অপমানিত হ'য়ে ফিরে আসেন। দোস্ত মহম্মদ সেদিন থেকে ভারত-শত্রু ব'লে পরিগণিত হন। ইংরাজ এই আমীরকে চাল-মাত করার জন্য নির্ব্বাসিত সা সুজাকে সাহায্য করেন। সর্ত্ত হয় সা সুজা আমীর হ'লে ইংরাজের বিনানুমতিতে কোন বিদেশী রাজার সঙ্গে সন্ধি বিগ্রহ করতে পারবে না। সুতরাং রণজিৎ, সা সুজা ও ইংরাজের মধ্যে একটা সন্ধি হ'ল যা'তে ক'রে সা সুজাকে সিংহাসনে বসান হবে। ১৮৩৯-৪২ সালে প্রথম আফগান যুদ্ধ ক'রে তাঁকে গদিতে বসান হয়। কিন্তু কাবুলিরা তাঁকে হত্যা করে ফেলে। তার পর অনেক গণ্ডগোলের পর দোস্ত মোহম্মদকে ফিরে আসতে দেওয়া হয়।

ওদিকে যা হবার তা'ত হ'ল, কিন্তু এই যে ইংরাজ জোর করে

লোকমতের বিরুদ্ধে সা সুজাকে আপন সৈন্য-বলে আমীর বানিয়েছিল এবং তার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে দেশময় অরাজকতা হ'তে দিয়েছিল, এ কথাটা আফগান কোন দিন ভুলতে পারল না। তারা ইংরাজকে তাই ঘৃণা ও সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগল।

১৮৫২ সালে রুশ ও পারস্যের চক্রান্ত করার ফলে, আর শিখ-যুদ্ধগুলিতে জয়ী হওয়ায় দোস্ত মহম্মদ ইংরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর পর তার পুত্র সের আলি আমীর হন। ১৮৬৯ সালে আবার মনোমালিন্য হয় এবং ১৮৭৮-৮১ সালে দ্বিতীয় আফ্‌গান যুদ্ধ হয়। সের আলি চেয়েছিলেন ইংরাজ যেন অঙ্গীকারে বদ্ধ হয় যে, তাঁর বংশ ছাড়া আর কাউকে সে আমীর স্বীকার করবেনা। লর্ড মেয়ো তাতে রাজী হলেন না। এদিকে ১৮৭৩ সালে সিস্তানের সীমা নির্দ্ধারণ নিয়ে পারস্য ও আফগানে ঝগড়া বাধে। ইংরাজ মীমাংসা ক'রে সিস্তান দু'ভাগ করে দু'জনকে দেয়। পারস্যের ভাগ্যে ভাল অংশ পড়ল, আর আফগানের ভাগ্যে অনুর্ব্বর মন্দ অংশ পড়ল। আফগানের মন ফের সন্দিহান হ'ল।

ওদিকে রুশ ১৮৫৬-৫৭ সালে আফগানিস্তানের উত্তর দিয়ে প্রাচীতে তার রাজ্যবৃদ্ধি আরম্ভ করলে। ইংরাজ মনে করল আফগানের উপর জোর খাটিয়ে নিজের কার্য্য উদ্ধার করবে। লর্ড লিটন সের আলীকে একজন স্থায়ী Residentকে কাবুলে থাকতে দেবার ব্যবস্থা করতে বললেন। ইংরাজের গায়ে পড়ে' ভাল করার কথায় অশ্রদ্ধা আগেই হ'য়ে গিয়েছিল, কাজেই এবার

শত্রুতা পেকে উঠল। এবারেও কাবুলে রুশ-দূতের সমারোহে অভিনন্দন করা হল, আর ইংরাজের মনোনীত রেসিডেণ্ট বহিষ্কৃত হল। কাজেই ১৮৭৮ সালে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ হল। ফলে সিবি, পেশিন ও কুরাম উপত্যকা ইংরাজের লাভ হয়। রুশের সাহায্য নিতে যেতে পথে ১৮৯৩ সালে সের আলীর মৃত্যু হয়। তার উত্তরাধিকারী ইয়াকুব খাঁ রাজ্য থেকে অল্পদিনের মধ্যে বিতাড়িত .হল। কিছুদিন অরাজকতার পর আব্দর রহমান আমীর হন। তিনি দেশে আবার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে রুশরাজ ১৮৮৫ সালে পেঁজদা অধিকার করেন। এতে ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ'বাঁধবার যোগাড় হয়। আমীর ইংরাজের সাহায্য চান। বিলাত থেকে রুশের রাজধানীতে চোট্‌পাট্‌ করে লেখালেখির ফলে রুশ ঠাণ্ডা হয়। এতে আমীরের বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়। তখন থেকে ১৯১৯ সালে হবিবুল্লার মৃত্যু পর্য্যন্ত এই দুই শক্তিতে বন্ধুত্ব অটুট ছিল। ১৮৯৪ সালে Durand Line দিয়ে ভারত ও আফগানের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। হবিবুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আমানুউল্লা আমীর হন ও ১৯১৯ সালে তৃতীয় আফগান যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধের কারণ—খেলাফৎ সমস্যা বা ইংরাজ কর্ত্তৃক তুর্কীর বাহিরে দুরবস্থা। ভারতের অভ্যন্তরীণ অশান্তির অবস্থা, ভারত সৈন্যের অবস্থান ও পাঞ্জাব হাঙ্গামায় ইংরাজের কর্ত্তৃত্ব যাওয়ার মত হয়েছে ভেবে' কাবুলিরা ভারত আক্রমণ করে। এর থেকে এই বুঝতে হবে যে ইংরাজ বাইরে বিপন্ন হ'লে আফগান ভারত-আক্রমণের সংকল্প রাখে। এইটি আমাদের বড় শিক্ষা। সন্ধির ফলে

দুই দেশে আপাততঃ বন্ধুত্ব হ'য়েছে। আফগান স্বেচ্ছায় সব দেশের সঙ্গে সন্ধি করতে পারে। তার মর্য্যাদা খুব বেড়ে গেছে।

বলশেভিকেরা সম্পূর্ণ বৃটিশ-বিরোধী সন্ধি করতে চেয়েছিল। আমীর উপস্থিত তাতে রাজী না হওয়ায় রুশ অন্য নীতি অবলম্বন করেছে।

আমাদের সীমান্ত সম্বন্ধে গোলযোগ এইখানে র'য়ে গেল। আফগানের বন্ধুত্ব থাকলে ভাল, কিন্তু বলশিভিকরা যে কোন দিন সফলকাম হবে না, তা বলা যায় না। তারা সীমান্তের অন্য পার্ব্বত্য জাতিদের উত্তেজিত করতে ক্ষান্ত হবে না। আর উপস্থিত সন্ধিতে মৈত্রী হয়নি, কেবল নামমাত্র শান্তি হয়েছে। এ সন্ধিতে মোটের উপর কাবুল লাভবান হয়েছে। তার মান ইজ্জৎ ঢের বেড়ে গেছে। His Highness থেকে His Majesty খেতাব জুটেছে। পররাষ্ট্রবিভাগে ইংরাজের তাঁবেদারী দূর হ'য়ে গেছে। উভয় পক্ষ বলেন, যুদ্ধ-জয় তাঁদের নিজস্ব। সে যা' হক Diplomacy বা কূট নীতিতে ইংরাজ যে হটে এসেছে, তাতে আর ভুল নাই। ইংরাজের এ অসম্ভ্রমের কারণ ইংরাজের বিশ্রী আফগান-নীতি। ইংরাজকে আফগান কোন দিন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখবে না।

রুশের কথা

রুশের অভিসন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা না করলে আফগান সীমান্ত সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হল না। অনেক দিন থেকে রুশ ভারতের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেও নানা কারণে এগুতে পারেনি। ১৮৫৭-৫৯ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের বাঁধন-ভাঙ্গা চেষ্টায় ও ১৮৫৯-৬০ সালে চীন-যুদ্ধে ইংরাজ ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় জারের মনোবাসনা সিদ্ধির উদ্যোগ আয়োজনের সুযোগ এনে দেয়। ভারত ও আফগানিস্থানের উত্তর দিয়ে প্রাচ্য ভূখণ্ডে রুশ রাজ্য-বিস্তার আরম্ভ করে দিল।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দে বোখারা দখল হল, ১৮৭৩ সালে ছলে বলে 'খিভা' ও কুক্ষিগত হ'ল। এখান থেকে সে দক্ষিণে অশুভ দৃষ্টি দিতে লাগল।

ইংরাজ এ চাল বুঝতে একটুও দেরী করেনি। ১৮৭৮-৮০ সালে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের ভিতরকার কথা ছিল রুশকে দাবার কিস্তি দিয়ে আটকে রাখা। এর ফলে আমীর সের আলী ও তাঁর উত্তরাধিকারী ইয়াকুব খাঁর পতনের পর আবদর রহমন যখন আমীর হ'য়ে একটু গুছিয়ে বসলেন, রুশ তখন আবার কার্য্য-সিদ্ধিতে মন দিল।

১৮৮১ সালে ব্যবসার অজুহাতে ঢু'কে জমাটি করে ও ধূর্ত্ততার ফলে আফগানের হাত থেকে মার্ভ (Merv) রুশ আদায় করে নিল। রুশ এখন ভারত ও আফগানিস্থানের এত কাছে এসে পড়ল যে প্রকৃত আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠল। এর পর ইংরাজ চেষ্টা-চরিত্র করে' ঠিক করল এলোমেলো ভাবে প্রাচ্য ভূখণ্ডে না থেকে মেপে জুপে আফগান ও রুশের অধিকৃত স্থানের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়ে যাওয়া চাই। ইংরাজ মধ্যস্থ হয়ে জরীপ করতে গেল।

১৮৮৫ সালে জরীপের মধ্যে রুশ মার্ভ থেকে খুস্কের পথে পেঁজদা বলে একটি গ্রাম জোর ক'রে দখল করল। স্থানীয় অধিবাসীদের উত্তেজিত ক'রে ইংরাজ কর্ম্মচারীদের হত্যা করতে বল্‌ল। ইংরাজরা বেগতিক দেখে Herat এ সরে গেল। রুশের সঙ্গে আমীর ও ইংরাজের সম্মিলিত যুদ্ধের সম্ভাবনা হওয়ায় রুশ যথালাভে সন্তুষ্ট থেকে যা তা একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে বিপদ এড়িয়ে গেল। আবার সীমা নির্দ্ধারণের কাজ চলতে লাগল। রুশের প্রভাব—Sphere of influence—Herat এর উত্তর পর্য্যন্ত এগিয়ে এল। ইংরাজও রুশ-ভীতিতে কোয়েটার দুর্ভেদ্য

দুর্গ সব তৈয়ের করে ফেলল। ভারতে সাজ সাজ রব চলতে লাগল। সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুরে সাজ সরঞ্জামের ধূমটা কিছু বেশী বেশী হয়েছিল। রুশ দেখল উপস্থিত এদিকে বেশী সুবিধা হবে না।

সে আরও পূবে চীনা মুল্লুকের দিকে হাত বাড়াল। মার্ভ থেকে পেঁজদা দিয়ে খুস্ক পর্য্যন্ত রেল খু'লে, কেল্লা বানিয়ে রুশ ইংরাজকে কোয়েটার উল্টো চাল দিল। এর মানে হল, দরকার হ'লে হিরাট হ'য়ে সে আফগানিস্থানে হানা দেবে।

সেই থেকে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত এ পথে আর বিশেষ কিছু গোলযোগ হয়নি।

এখন কিন্তু বলশেভিক রুশিয়া আবার ভয়ের সঞ্চার করছে। ১৯২০ সালে মস্কোতে Third International এর সভায় Lenin স্পষ্ট বলেন, "England পৃথিবীর মধ্যে আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু। আমাদের কর্ত্তব্যই হবে ইংরাজের সাম্রাজ্য-গৃধ্নুতাকে তুরস্ক, পারশ্য ও সাধারণভাবে এশিয়া থেকে মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলা। ভারতেই ওদের আমরা সব চেয়ে বড় মার মারব।" এর চেয়ে স্পষ্ট ঘৃণাব্যঞ্জক ও ভয়-দেখান ভাব প্রকাশ হ'তে পারে-না। পরে তিনি এও বলেছিলেন, "লণ্ডন যেতে হ'লে কাবুল আর ভারতের ভিতর দিয়ে যেতে হবে।" বিপদের ধাঁজটাও কিছু বদলে গেছে। কূটনীতি ও ধাপ্পাবাজীর সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে জারের কর্ম্মচারীরা চেপে পড়তে চাইত। যদিও বর্ত্তমান বলসেভিদের আমলে জারের রাজত্বের রাজ-নীতিকদের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছেনা, তবুও জাতীয়

রাষ্ট্র বজায় রাখতে গেলে ভবিষ্যৎ বিপদের কথা ভাবতে হবে। বিশেষ যখন দেখা গিয়েছে যে বলশেভি-মতবাদের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে যে কোন পন্থা গ্রহণ করতে বলশেভিরা বাধ্য।

পৃথিবীতে দুঃখী ও অভাবগ্রস্তের সংখ্যাই বেশী। মানুষ স্বভাবতঃ চায় সুখে বসবাস করতে। যেমন ক'রে হ'ক নানা-কারণে বলশেভিকদের ভাবনা জগতে ছড়িয়ে পড়ছে। ভারত সীমান্তের পার্ব্বত্য জাতিদের ভিতরও তারা প্রভাব বিস্তার করতে কম করছে না। অবশ্য এ সব যায়গায় তারা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। পারস্যেতে তারা একটা হৈচৈ-করা দল খাড়া করেছে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাদের মাঝে মাঝে ধ্বস্তাধ্বস্তিও হচ্ছে। পারস্যের উত্তরে যদি তারা কাজ গোছাতে পারে, তা হ'লে সে তাল এসে পড়বে বেলুচিস্থান ও আফগানি-স্থানের উপর।

আফগানিস্থানের নতুন কথা:—আফগানিস্থানের বর্ত্তমান চাঞ্চল্য এবং রাজা ও রাজতন্ত্র বদলা-বদ্‌লীর কথা টাট্‌কা ঐতিহাসিক ব্যাপার। সমবেতভাবে জাতি প্রস্তুত হবা'র আগে তাদের সংস্কার, বুদ্ধি ও মনের কাছে অসহ যে সকল সংস্কার, তা কায়েমী করার কঠোর চেষ্টায় এবং বিদেশী স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন মতের চরদের চেষ্টায়,—সর্ব্বোপরি বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী ও আমলাদের ওপর নির্ভর করার ফলে আমীর আমানুল্লা রাজ্য হারান। কিন্তু এই অন্তর্বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানে দুটী Sphere of iufluence—বিভিন্নমুখী প্রভাব-প্রতিপত্তির আসর সৃষ্ট হ'য়ে পড়ল। একদিকে রুশ, অন্য দিকে ইংরেজ। উভয়ের মুখে

আত্মরক্ষা ও মানসম্ভ্রম রক্ষার দাবী জেগে উঠছে। য়ুরোপের বলকানজাতিগুলির মত আফগানিস্তানও জগতের আগামী ধ্বংসলীলার উপযোগী বিস্ফোরন্মুখী একটী ভয়াবহ স্থান। কখন বারুদে আগুন লাগে বলা যায় না। আমীর আমানুল্লার সমূহ বিপৎপাতে সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যবাদ লাভবান হল সত্য, কিন্তু এর ভাবী ফল ভাল হল না। অন্ততঃ আমানুল্লা যদি কোন দিন রাজ্য ফিরে পান, তাঁর রুশপ্রীতি প্রবলতর হবে। অবশ্য সেটা আত্মরেখে ধর্ম্মগোছের ব্যাপার দাঁড়াবে। মোটের উপর যদি রুশের কূটনীতি সাফল্য লাভ করে, তাহ'লে ভারত-আফগান সম্বন্ধটা বেয়াড়া আকার ধারণ করবে।

শুধু এই ঘটনায় ভারত-সীমান্ত রক্ষার সমস্যা আরও জটিল হ'য়ে উঠছে। মস্কোচালিত আফগান ও পাহাড়ীদের একযোগে ভারত-আক্রমণ, বিশেষতঃ আধুনিক উৎকৃষ্ট রকমের সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য-সমাবেশ নিয়ে হলে ব্যাপারটা বড় সোজা হবে-না। সেটা যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ।

রুশ যদি তখন আফগানের সাহায্য না পায়, তা হ'লে সে আফগানিস্তানকে বলশেভিক ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে বোখারায় কমিউনিষ্ট ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি আফগান বিপ্লবীর দল গড়ে তোলা হচ্ছে। এমন কোন রাজা নাই, যার পরম শত্রু নাই। আমীর অন্তরায় হ'লে তার শত্রুকে প্রতাপশালী ক'রে এই আমীরকে উল্টে দিয়ে আফগানিস্তানে বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করার চেষ্টা হবে। এর পেছনে আবার সোভিয়েট সৈন্য, আর তার উপর থাকবে মস্কোর কূটনীতি।

এর পরেই পাহাড়ীয়াদের উত্তেজিত করা হবে। তাহ'লে ভারত সরাররি রুশের সীমান্তের ধারে এসে পড়ার সামিল হবে।

একথা বলা বাহুল্য যে আফগানের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য যেমন তার নিজের জন্য দরকারী, তেমনি ভারতের পক্ষেও প্রয়োজনীয়।

উত্তর সীমান্ত

এই সীমান্তকে কাজ চালান হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—

(১) উত্তর সীমান্ত

(২) উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত

উত্তর সীমান্ত—পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ। জামুর পূর্ব্বধার থেকে আরম্ভ ক'রে ভূটানের পূর্ব্ব কিনার পর্য্যন্ত এই সীমান্ত বিস্তৃত।

উত্তর সীমান্ত মোটামুটি নিরুপদ্রব। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া Mount Evarest এই লাইনের উপর, এরই ঠিক উত্তরে তিব্বৎ। দার্জ্জিলিং ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে, চুম্বি উপত্যকা দিয়ে, সিকিমের ভিতর হয়ে, তিব্বৎরাজ্যে যেতে কতকটা সহজগম্য পথ

পাওয়া যায়। তিব্বতী সৈন্যরা আধুনিক প্রক্রিয়ায় নামমাত্র শিক্ষিত হচ্ছে বটে, তা হলেও ওদেশের সাধারণ অবস্থা নিতান্ত সেকেলে। ১৯০৬ সালে চীনের সঙ্গে ইংরেজের একটা বোঝাপাড়া হয়, যাতে করে চীনের প্রাধান্য তিব্বতে নামে স্বীকৃত হ'লেও চীন কার্য্যতঃ এর অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না, এরূপ সাব্যস্ত হয়। এদিকে তিব্বৎ ভারত সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করেছে। নানা অন্তরায়ে এ যুগের উপযোগী যুদ্ধ চালান এর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ওখান থেকে মারাত্মক ভয় কিছু নাই। তা ছাড়া তিব্বতের ভিতর দিয়ে কোন শক্তি প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে ভারতকে আক্রমণ করতে পারবে না।

জামু থেকে যত পূবদিকে যাওয়া যায়, বৃটিশ ভারতের প্রান্ত-ছোঁয়া মেলা দেশীয় রাজ্য পাওয়া যাবে। এদের বৈদেশিকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির করার ভার ইংরেজের উপর। এদের স্বার্থ ভারতের স্বার্থের সঙ্গে মেলে। একমাত্র স্বাধীন রাজ্য হচ্ছে নেপাল, তার আধুনিক ধরণের সৈন্য আছে। গত যুদ্ধের সময় মহারাজ বহু গুর্খা সৈন্য পাঠিয়ে ভারতের শান্তিরক্ষার কার্য্যে সহায়তা করেছেন। ১৯১৭ সালে মাসুদদের বিরুদ্ধে এর সৈন্যরা ইংরেজের হয়ে লড়েছিল। নেপালীদের ভর্ত্তি করে ২০টী গুর্খা Battalion ইংরেজ ফৌজে রাখা হয়েছে।

টিরাই (Teri) বা ঘাড়ওয়াল রাজ্য—গুর্খাদের মত এরাও ভারী যোদ্ধা। ১৯১৪ সালের আগে এদের তেমন লড়ায়ে ব'লে খ্যাতি ছিল না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এরা সবাইকে ছাড়িয়ে

উঠেছিল। আজকাল এরা উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীর কাছে ভারী প্রিয়।

আর দুটি রাজ্য হচ্ছে সিকিম্ ও ভূটান। এদের সৈন্যসংখ্যা নগণ্য।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত—এ সীমান্তের কতকটা অংশ পড়েছে ব্রহ্মদেশের ভিতর।

এতদিন পর্য্যন্ত যা কিছু সীমান্তের ভয় ভাবনা ছিল, তা উত্তর-পশ্চিম নিয়েই ছিল। কেন না ঐদিক থেকে শক্তিশালী লুব্ধ পাশ্চাত্য শক্তি এসে ভারতের মর্ম্মস্থল নিজের কাবুতে আনবার কল্পনা করত। কর্ণেল সেক্সপিয়ার এদিককার (উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের) প্রয়োজনীয়তা লর্ড কার্জ্জনের সামনে খুলে ধরেন।

প্রাচ্যের জাতিরা আলস্য, অজ্ঞতা ও অবসাদে ডুবে ছিল। শত শত বৎসরের জড়তা ভেঙ্গে চীন জেগে উঠেছে,—জাপান ত পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তি। চীন জাগার সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনার সাড়া পড়েছে যে, যেভাবে তার লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে চল্লিশ কোটি লোকের স্থান সঙ্কুলান ওখানে হওয়া শক্ত। কাজেই তাকে নানাদেশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়তে হবে। ভারতের হাজার মাইল তার সীমানার সঙ্গে মিশে আছে। জাপানের ঔদরিক সমস্যাও ঐ রকম। তার ওপর তার কোমরে বল আছে। শান্তিতে যদি এ সমস্যার মীমাংসা না হয়, তা হলে ভারতের গায়ে আঁচড় লাগবে কি না তা কে বলতে পারে? **Washington conference**এর বন্দোবস্তের সঙ্গে গত যুদ্ধের

অবসাদ ইয়ুরোপকে ঘর গোছানোর কাজে ব্যস্ত রে'খে দেবে ব'লে প্রাচী ও প্রশান্ত উপকূলে যুদ্ধবিগ্রহের ভারকেন্দ্র সরে এসে পড়েছে।

আসাম সীমান্তের উত্তরাংশ ভারত সংলগ্ন বটে,কিন্তু পূর্ব্বভাগটা ব্রহ্ম ও ভারতের মাঝে পড়েছে। উত্তর অংশ ভূটানের পূর্ব্ব হ'তে সদিয়ার উত্তরস্থিত পর্ব্বত পর্য্যন্ত গেছে। এতে মিসমি দেশকে তিব্বতের জায়যুল প্রদেশ থেকে পৃথক করেছে। এটি লম্বায় ৩২৫ মাইল হবে। এই সীমান্ত ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে অবস্থিত। ইংরাজের ছাড়পত্র ছাড়া এ সীমানা পার হ'য়ে কেউ তিব্বতে যেতে পারে না। এ সীমান্তরেখা ও তিব্বতের দক্ষিণ সীমার মধ্যে ৫০-১০০ মাইল গভীর জায়গা পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য জাতিদের বাস। মোটের উপর ওই জায়গা ইংরেজের প্রভাবের ভিতর। পশ্চিম থেকে পূবে যেতে যে সব জাতিদের দেশ পড়বে, তাদের নাম আকা, দফলা, মিরি, আবর ও মিশমি। তারা অসভ্য-অশিক্ষিত। পুরাকালের অস্ত্র ছাড়া অপর কিছু এখনও ব্যবহার করতে শিখে নাই। তারা রণপ্রিয় নয়, ধর্ম্মান্ধও নয়। কেবল অবররা যা কিছু দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ। যুদ্ধে তারা ১০০০০-১৫০০০ লোক নাবাতে পারে। ঐ সব জাতিদের কারু কারু সঙ্গে কোন সন্ধি-চুক্তি না থাকলেও তাদের যে একটা করে বিরাট Subsidy বা বৃত্তি দেওয়া হয়, তাতে তাদের পূর্ব্বকার লুণ্ঠন বৃত্তির কণ্ডুয়ন অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে। তা ছাড়া আসামের সমতলক্ষেত্রে তাদের পণ্য আনলে তারা লাভবান হয় ব'লে বড় একটা গোলযোগ করে না। শাসনকার্য্যের জন্য সীমান্ত প্রদেশকে দুভাগে

বিভক্ত করে দুটি Political officer (responsible to Assam Govt.) এর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারা যতদূর সম্ভব নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চালায়। সাধারণতঃ ঐ অসভ্য জাতিদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হয়না,তবে ইংরেজের অনিষ্ট বা তার প্রজাদের খুন জখম করলে তখন চেপে ধরা হয়। Military police দিয়ে শান্তি রক্ষা হয়। গোরা সেনাপতির অধীনে নিছক সৈন্যের সমান ক'রে এ পল্টনকে শিক্ষিত করা হয়; ছোট-খাট ব্যাপারে এদের চোট যথেষ্ট, তবে অতিরিক্ত মাত্রার ব্যাপারে আসল সৈন্য লাগাতে হয়।

সন।	যে জাতির সঙ্গে গোলযোগ।	নিযুক্ত সৈন্যসংখ্যা।
১৮৭৪	দফলা	৭৯১
১৮৮৩-৮৪	আকা	৭০০; ৩টা কামান
১৮৯৯	মিশমি	৮০০; ২টা কামান
১৯১১	আবর	১৩৭০

এ দিক দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে কোন ভয় নাই। পাহাড়ে জাতিদের হঠাৎ রণকুশল হওয়ার সম্ভাবনা নাই; নতুন যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের উপায়ও নাই। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে ওরা চীনা ও ও তিব্বতীদের দ্বারা উত্তেজিত হতে পারে। সুতরাং চীন যদি নতুন করে সেজে গুজে উঠে, তা হলে মুখ্যভাবে নিজে বা গৌনভাবে তিব্বতের ভিতর দিয়ে বিষক্রিয়া করতে পারে। এই রকম একটা কিছু ধারণা করলে সমস্যাটা একটু নতুন রকমের দাঁড়ায়। চীন অবস্থান্তরে প'ড়ে এ সীমানা লঙ্ঘন করছে না বটে, কিন্তু সে একটু চাঙ্গা হলেই এদিকে পা বাড়াবে।

১৯১০ সালে তার তিব্বত-অভিযানে সে রকম নমুনা একটু যে পাওয়া যায়নি তাও নয়। আসাম আক্রমণ একদিন অসম্ভব না হলেও চীনের বর্ত্তমান অবস্থায় সে ভয় নাই।

এ বিষয়ে আসাম গবর্ণমেণ্টের ১৯২৭-২৮ সালের রিপোর্ট থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি। তিব্বত থেকে ভারতে পৌঁছাতে লাসা—উদল গুড়ি পথ সব চেয়ে খাটো। এ পথের উন্নতি সাধন করলে ব্যবসা-বাণিজ্য খুব বিস্তার লাভ করবে। বালি-পাড়া সীমান্ত ক্ষেত্রের পলিটিক্যাল অফিসার সুপারিস করছেন যে একজন গোরা সেনানীর অধীনে কিছু খাঁটি সৈন্য (মিলিটারী পুলিশ ছাড়া), একটি ক'রে হাঁসপাতাল প্রত্যেক ছাউনিতে রাখা সুযুক্তি। চিকিৎসা বিভাগ দিয়ে অসভ্যজাতিদের ওপর প্রভাব-বিস্তার সহজে হয়। গামিরি মুল্লুক(Gamiri country) তিব্বতের টোয়াং (Twang) হুদ্দার সন্নিকট এবং লাসা উদলগুড়ি পথের কাছে পড়ে। চীন একটু সুস্থির হতে পারলেই যে তিব্বত-সমস্যা জটিল হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখনও তিব্বত ও লাসার উপর চীনের চক্ষু আছে। তিব্বতে চীনার পক্ষপাতী দল শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠছে। চীন যদি একবার তিব্বতে কর্ত্তৃত্ব করতে পারে, তাহলে টোয়াং প্রদেশে সহজ ও গোপনে ভারত প্রবেশের আড্ডা বানিয়ে ফেলবে। আবার ওদিকে রুশও এ সন্ধানে তিব্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাকানোর চেষ্টাতে আছে। যদি সফলতা লাভ করে ত এই পথে ভারতে তার চর পাঠাবে।

আসাম সীমান্তের পূর্ব্ব অংশ ব্রহ্মের পুটাও থেকে দক্ষিণ

পশ্চিম রোখে ৬২০ মাইল গিয়ে চট্টগ্রামের দক্ষিণে না-আফ (Naiaf) নদীর মুখ পর্য্যন্ত গেছে। এর অধিকাংশ জায়গা অজানা-অদেখা অবস্থায় রয়ে গেছে। অর্দ্ধ-স্বাধীন কতকগুলি জাতির বাস এ পথে পড়ে। এর মধ্যে বড় রাজ্য হচ্ছে মণিপুর। মণিপুরের বিস্তৃতি হচ্ছে ৮৪৫৬ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। এর মধ্যে ১।৩ অংশ ভূত-প্রেত-মানা জঙ্গলীজাতি। যদিও এদিককার জঙ্গলী জাতিরা সাধারণতঃ ইংরেজকে ক... দেয়না, তবুও ওদের অতীত ইতিহাস থেকে এটুকু বোঝা গেছে যে যখন গবর্ণমেণ্ট অন্যদিকে ব্যস্ত থাকবে তখন ওরাও তাণ্ডব করতে ছাড়বে না। এদের লুটপাটের প্রবৃত্তি ঠাণ্ডা রাখতে গেলে এদিক থেকে দেখানভাবে বেশী সামরিক শক্তির আয়োজন রাখতে হয়। সীমান্ত প্রদেশের স্থানে স্থানে মিলিটারী পুলিশের ছাউনী রাখতে হয়। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কুকি ও নাগাদের উৎপাত দমনে রাখার জন্যে মণিপুরে ঘাঁটি সেপাই (Regular Infantry) রাখতে হয়েছিল। এখানে একটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে বৈজ্ঞানিক বা সভ্য জগতের অনুমোদিত খবরাখবরের ব্যবস্থা এদিক দিয়ে ব্রহ্মের ভিতর পর্য্যন্ত নাই। ব্রহ্মে যেতে গেলে এক সমুদ্র পথে যেতে হয়। ডাঙ্গাপথে যাতায়াতের বন্দোবস্ত হয়ে গেলে ভাল হয়। দুটোপথ রেল বা চলাফেরার পক্ষে সম্ভব—

(ক) উত্তর পথটায় আসাম বেঙ্গল রেলের তিন সুকিয়া জংশন হয়ে একেবারে পূব দিক ঠেলে গিয়ে লিডোয় (Ledo) পৌছান যায়। সেখান থেকে পথটিকে হুকং উপত্যকা হয়ে উত্তর ব্রহ্মের মিটকিনা পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। রণনীতির কৌশল

হিসাবে এ পথটা খুব কাজে লাগতে পারে। মিটকিনায় একটা বড় ছাউনী আছে।

(খ) দক্ষিণ পথটি চট্টগ্রাম থেকে গিয়ে ব্রহ্মের চিনডুইন নদীর তীরস্থ Alone বা Monywa পর্য্যন্ত যেতে পারে। মান্দা-লয়ের সঙ্গে এখানটার রেলের যোগ আছে; ব্যবসার দিক থেকে এটি বেশ লাভজনক হতে পারে।

মনিপুর-ব্রহ্মের পথের নাম উল্লেখ মাত্র হতে পারে।

ব্রহ্মের কথা—উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের এই অংশটি তিব্বতের জয়উল (Zoyul) প্রদেশ থেকে টেনেসিরম প্রদেশে পাকচান নদীর দক্ষিণে ভারত সাগরে গিয়ে পড়েছে। এটি ১৫০০ মাইল হবে। এর ১০০০ মাইল চীনের সঙ্গে, ১২৫ মাইল ফরাশীর টংকিং, আর বাকিটা শ্যাম রাজ্যের সঙ্গে মিশেছে।

(ক) চীনা বিভাগ—উত্তরে কামটীলং (Hkamtilong) এখানে মিলিটারী পুলিশের ঘাঁটি। ১৯১১ সালে চীনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে এ অংশটি ইংরেজের অধীনে আনা হয়েছে। এখানকার প্রধান নগর পুটাও (Putao)। এখনও উত্তর সীমানা নিয়ে চীনদের সঙ্গে গোলমাল যাচ্ছে। চীন মিটকিনার ৫০ মাইল উত্তর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (Pauwa pass) দাবী করে।

লড়ায়ের কায়দার দিকে নজর রেখে ইংরেজের মীমাংসা যতটা ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (Shajang pass) তাতে খুব সুবিধা ক'রে দিয়েছে। ব্রহ্মের দিকে চীনের প্রবেশ করার চেয়ে চীনেদের দেশে ইংরেজের প্রবেশ করা সহজসাধ্য হবে। তা ছাড়া পার্ব্বত্য

জাতিরা ঠাণ্ডা ও ইংরেজের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন। Pauwa'pass এর দক্ষিণ সীমানা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে তাওপিং নদী পর্য্যন্ত গিয়ে পশ্চিমে বেঁকে টেংগুয়ে পৌছেছে। এও বেশ কায়দার জায়গা। তাওপিং থেকে Namkham পর্য্যন্ত ১০০ মাইল সমতল ভূমি পার হ'য়ে সালউইন নদীতে এসে পৌছেছে। তারপর দক্ষিণ-মুখো মেকং নদীর ধার দিয়ে টংকিং সীমানায় গিয়ে থেমেছে। পথে ওয়া (Wa) নামক বর্ব্বর জাতির দেশ। তাদের মানুষ মারার খেয়াল দেখে চীনা বা ইংরেজরা তাদের ঘাঁটায় না। মোটের উপর চীন সীমান্তের কাছে যে সব অসভ্য জাতিরা বাস করে, কেবল তারাই চীন ও ইংরাজ উভয়ের অনিষ্টাচরণ করে। চীনাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা ঐসব জাতিদের সঙ্গে বিবাহ আদান-প্রদান করে। তাতে ঐদিককার ব্যাপারটা আরও গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। চীনের উপস্থিত দুর্ব্বলতায় যত আইনভঙ্গকারী আর উচ্ছৃঙ্খল লোক জমাট হয়েছে ঐ সব জায়গায়। কাজেই ওখান থেকে বৃটীশ ব্রহ্মে অভিযান করা অসম্ভব নয়। তবে তাদের যুদ্ধাস্ত্র তেমন মারাত্মক নয়, তাই রক্ষা।

রণচাতুর্য্যের দিক থেকে যাচাই করে নিতে গেলে Pauwa Pass থেকে টংকিং পর্য্যন্ত বড় কায়দার স্থান—বরাবর চীনের ইউনান প্রদেশে লাগোয়া। ইউনানের লোকসংখ্যা ১০০,০০,০০০। পথঘাট ক্লেশকর হলেও, জায়গা জায়গা দিয়ে আধুনিকভাবে গঠিত ও শিক্ষিত সৈন্য বেশ যাতায়াত করতে পারে। তিনটি রাস্তা এদিকে আছে—

(১) মিটকিনা থেকে টেংগুয়ে, ক্যানলিয়াং পাশ দিয়ে যাওয়া যায়।

(২) কুলিখা দিয়ে ভামো থেকে টেংগুয়ে।

(৩) কুনলং ফেরি দিয়ে ল্যাসিও থেকে চীনের অধীনস্থ শান ও ওয়া রাজ্য। এদিকে রেল নাই।

ইউনানের পিছনে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে স্বাবলম্বী (Self-contained) প্রদেশ Sjechwan। তার লোকও যত, প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যও তত। চীনের দুর্দ্দিন ও আত্মকলহ যদি যায় বা চীন যদি অন্য জাতির হাতেও পড়ে ভারতের পক্ষে তাতে ছাড়াছাড়ি নাই। ইউনান ও সিচেয়াং যারই হাতে যাবে, সেই ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত করবে। যদি ইংরেজ চীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় বা ইংরেজ যার সঙ্গে লড়বে, তার প্রতি চীন সুপ্রসন্ন হয়, তাহলে প্রশান্ত উপকূলে মূল যুদ্ধ হলেও এইখান দিয়ে ভারতে চাপ পড়বে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের মত এখানের পার্ব্বত্য জাতিরা—কাচিন, ওয়া, চীনাশান—উৎপাত করতে কসুর করবে না। ফলে এদিকে অনেক সৈন্যকে থাকতে হবে। অথচ তারা আদত যুদ্ধস্থলে গেলে কাজ বেশী হ'ত। গত যুদ্ধের সময়ও কাচিনরা বেজায় বিভ্রাট করেছিল। মিটকিনার কাছাকাছি লুটপাট, আগুন লাগিয়ে পোড়ান, খুন-জখম যথেষ্ট করেছিল। মনিপুরের কুকিরাও তাতে সাড়া দিয়েছিল।

(খ) টংকিংএর দিকে Mekong নদী থাকায় উপস্থিত ক্ষেত্রে তত অসুবিধা হবে না।

(গ) শ্যামের দিক থেকেও তত ভয় নেই। ইংরেজ-

ফরাসীর অনুগ্রহের উপর এই রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে। অবশ্য শ্যামের লোকসংখ্যা ৮০,০০,০০। আধুনিকভাবে শিক্ষিত ও সজ্জিত সৈন্য তার আছে। শান্তি অবস্থায় তার কায়েমী সৈন্য ২৫০০০, আর যুদ্ধের সময় বার করতে পারে ৭৫০০০। শ্যাম থেকে ব্রহ্মের মাঝে যাতায়াতের পথ তেমন সুবিধাজনক নয়। রেল হবার কথা হচ্ছে। উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে রণনীতিকের পক্ষে মাত্র চীন-সংলগ্ন ১০০০ মাইল জায়গা আশঙ্কাজনক। চীনের ঘরোয়া গোলযোগ না মেটা পর্য্যন্ত এদিকে তত ভয় নাই।

সীমান্ত-নীতি

সীমান্তে যারা আছে তারা আলাদা হলেও তাদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্কে রাখতে হয়, যাতে নিজের আত্মরক্ষা ও মানসম্ভ্রম রক্ষার সুবিধা হয়। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড যেটা বা যে গুলো হক—মাপ জোপ করে লাগাবার আগে দেখে নিতে হবে দরকারটা যেন সমরনীতির তথা রাজনীতির দিকে থেকে হিসাব মাফিক হয়। অবশ্য রাজনীতির প্রয়োজন বড়। সমর-নীতি শুধু রাজনীতির পরিপোষক। তা হ'লেও দুটো এত বড় জিনিষ যে আলাদা বিচার বিবেচনা ক'রে তবে একটা সাফাই নীতি অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত।

আমাদের সীমান্তনীতির অন্তর্গত হচ্ছে—আফগানিস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক আর ইংরাজ আইনে শাসিত সীমান্ত প্রদেশ ও

ডুরাণ্ড লাইনের মধ্যে অধিবাসী পাহাড়ে জাতিদের সঙ্গে সম্বন্ধ বা তাদের বিষয়ে আমাদের মনোভাব ও তদনুযায়ী আচার-ব্যবহার। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে এখন তেমন হাঁক ডাক নাই। সুতরাং ও বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখন করব না। লরেন্স, মেয়ো, নর্থব্রুক থেকে আরম্ভ ক'রে সেদিন পর্য্যন্ত সব বড়লাট—অকল্যাণ্ড, লিটন ছাড়া—ধরে রেখেছিলেন, আফগানিস্তানের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধুত্ব আর পাহাড়ে দেশে নিরর্থক হস্তক্ষেপ না করা হবে বৃটিশের সীমান্ত নীতি। ১৯২২ সালে এর ব্যতিক্রম ক'রে Waziristanএর কতকটা পাকাপাকি অধিকার করার সিদ্ধান্ত হয়। এতে আমাদের ভাল হবে কি মন্দ হবে, এ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। মতভেদ বলছি এই জন্তে যে একদল বলছেন আমাদের Close door policy ("ফাটক বন্ধ হ্যায়" নীতি) নেওয়া উচিত। সম্ভবপর হ'লে ভারতের প্রাকৃতিক সীমান্ত সিন্ধুনদ অবধি পিছিয়ে চলে আসা ভাল। ওয়াজিরস্তান ছেড়ে আসতে হবে। আর একদল বলে আমাদের Forward Policy নিতে হবে—এগিয়ে গিয়ে ডুরাণ্ড লাইন প্রকৃত দখলে এনে যতদূর সম্ভব ভারতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-কানুনের বাঁধনের ভিতর পাহাড়েদের আনতে হবে। যেটাই হ'ক, একটা নীতি ধ'রে চল্‌লে স্বভাব-শিক্ষিত, জন্মযোদ্ধা পাহাড়েরা তা বুঝতে পারত কিন্তু কখন কড়া, কখন মিঠেকড়া চালে চলায়, ওরা বৃটীশের উপর শ্রদ্ধা হারিয়েছে। ইংরাজকে ফাঁকে পেলে ওরা বেকায়দা করতে ছাড়ে না; আবার ইংরেজও নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্ম কখন বোড়া কখন ঢোড়ার কামড় দেন—তারপর যে যার

ঘরে ফিরে আসে। পাহাড়েরা ওটাকে লড়াইয়ের জানে-প্রাণে মারার ব্যাপার না ভেবে অনেকটা বাইরের টিমের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ দেওয়ার মত উপভোগ্য মনে করে। ভক্তি-শ্রদ্ধা ত করেই না—স্থায়ীভাবে ভয়ও করে না। যারা হটে আসতে বলে, তাদের কথা হচ্ছে—ইংরাজেরা যে বড় বেশী শক্তিশালী সেটা মার দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে চলে এলে হবে এই, যে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ তাদেব দেওয়া হবে না। আর দূরে থাকলে ওদের রাগ পড়ে যাবে। মনে মনে একটা আতঙ্ক থেকে যাবে। কাছে পিঠে থেকে শাসন করতে গেলে আজন্ম-স্বাধীন জাতি সব সইবে, কিন্তু স্বাধীনতা হারাণর হীনতা সইতে পারবে না। কাজেই পুনঃ পুনঃ গেরিলা যুদ্ধ করবে। তারপর আবার ওরা এখন আগের চেয়ে বেশী রকম রণচাতুর্য্য দখলে এনেছে—উৎকৃষ্টতম বন্দুকও যোগাড় করেছে, কাজেই শেষটা ভাল হবে না।

আর ওখানে এগিয়ে হবেই বা কি? এতাবৎকাল কত Punitive expedetion পাঠিয়ে শাস্তি দেওয়া হল। তাতে লুঠতরাজের প্রবৃত্তি কি এক চুলও কমেছে? বরঞ্চ স্যাণ্ডম্যান সাহেব বেলুচিস্থানে যে নীতি অবলম্বন ক'রে মারি জাতটাকে ঠাণ্ডা রেখেছে, যে নীতির ফলে Swati, Dir, Iushufzai প্রভৃতি শান্ত হয়ে রয়েছে। সেই নীতি ঐ অঞ্চলে চালালে ভাল হয় না? ওই জঙ্গলী জাতদের সর্দ্দারদের হাতে ওদের শাসনভার দাও, আর সর্দ্দারদের টাকা দিয়ে বশ কর, বন্ধুত্ব কর। তাদের অধীনস্থ লোকের কসুর হলে সর্দ্দারদের জবাবদিহি কর। তাহ'লে তারা নিজেদের প্রচণ্ডনীতিতে নিজেরা ঠাণ্ডা থাকবে।

নইলে লড়ায়ে বছর বছর এতগুলো টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে কার উপকার হচ্ছে? আমাদের সভ্যমুলুকের সীমানায় যারা থাকে, তাদের অস্ত্র রাখতে দাও, সীমার ধারে-ধোরে যে সব ঘাঁটি আছে, সে সব জায়গায় খয়ের খাঁ পাহাড়েদের ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখ—গোঁয়ার গোবিন্দরা তা হ'লে ইঁটের বদলে পাটকেল খেয়ে হয়রাণ হয়ে যাবে।

যদি বল আমাদের অনুরক্ত পাহাড়ে সৈন্তেরা ১৯১৯ সালে আমীরের ডাকে মাসুদদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তার উত্তরে এই বলা যায় যে যুদ্ধের সময় ওয়াজিরস্তানের সুদূর দক্ষিণ পশ্চিমে ওয়ানায় যে মুষ্টিমেয় সৈন্ত ছিল অথবা খাইবারে যে পাহাড়ে সৈন্ত ছিল, তারা দুটো টানে ত পড়েই ছিল; তা ছাড়া যেদিক থেকে সাহায্য আশা করে, সেদিক থেকে সাহায্য পেল না, অথচ শত্রুর দিক থেকে বিপদ বাড়তে লাগল। সেই অবস্থায় তারা ভেগে যায়। সে জন্ত তাদের বেশী দোষ দেওয়া যায় না। আফগানেদের সঙ্গে তাদের ভাষা, রক্ত ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ, অথচ তারা আমাদের দিকে ছিল। আমরা কিন্তু যুদ্ধে অন্তদিকে ব্যাপৃত থাকায় তাদের শত্রু-কবল থেকে রক্ষা করতে সময় মত সাহায্য পাঠাতে পারি নি,—সেটাও বিচারের রায় দেবার আগে বিবেচনা করতে হবে।

তারপর ও অনুর্ব্বর, অনুন্নত জায়গায় আর কিছু হবে না—ব্যয় যে বাড়ান হবে সে টাকাই বা আসবে কোথা থেকে? এখনি যে খরচ হচ্ছে, তাই ত কমাবার জন্ত লোকে উঠে পড়ে লেগেছে। আর সে খরচ ত বড় কম নয়। ভারতসরকারের

সর্ব্বসাকুল্যে যত আয় হয়, তার শতকরা ৬৬ টাকার উপর খরচ কি ছেলে-খেলা !

যে ওয়াজির আর মাসুদদের পঞ্চাশ হাজারের বেশী যোদ্ধা নাই, তাদের দমন করার জন্য ইংরাজ ৬৫,০০০ সৈন্য পাঠিয়েছিল —এটা কি লজ্জার কথা নয় ?

Forward policy বা এগিয়ে যাওয়া দলের দিক থেকে, Commander-in-chief Rawlinson বলেছেন ওয়াজিরদের দমন করবার জন্য মাসুদদেব দেশটি সসৈন্যে অধিকারে রাখতে হবে। ওদের বুকের উপর বসে জগদ্দল পাথর হয়ে থাকব ! চলাফেরার জন্য ভাল রাস্তা তৈয়ের ক'রে সৈন্য চলাচল দেখিয়ে ওয়াজিরদের ভীত, সন্ত্রস্ত ও চকিত করে রাখা হবে। সেই জন্য রাজমাকে (Razmak) নিয়মিত শিক্ষিত সৈন্য রাখা হবে। ওয়াজিরস্তানের দক্ষিণ পূর্ব্বে Jandola থেকে উত্তরে Razmak পর্য্যন্ত গিয়ে রাস্তাটি ঘুরে ফিরে টচি উপত্যকার Ishaতে যাবে। আর এক রাস্তা Jandola থেকে Sarwekai পর্য্যন্ত যাবে। দুটো মোটরের রাস্তা লম্বে ৯০ মাইল হবে। প্রবল সৈন্যদল থাকবে Jandolaয়, Razmkএ এবং Razmak থেকে Tochi পর্য্যন্ত ভিতরের সব ঘাঁটিতে। Razmak থেকে Jandola ও Sarwekai যে সব আড্ডা আছে, সেখানে থাকবে খাসাদার আর Scoutরা। গ্রীষ্মকালে Miransha, Dardoni বা Tankএ উড়োজাহাজের আড্ডা থাকবে। প্রধান সেনাপতি মনে করেন, এই বন্দোবস্ত রাখলে মাসুদরা চুপ মেরে যাবে—তা হলে Tochiবা ওয়ানার Wazirরা আর উচ্চবাচ্য করবে না।

এর বিরুদ্ধে বলবার যা আছে তা এই। ভারতের সুশিক্ষিত সৈন্য Sappers, miners, pioneersদের Wazirstanএর মত কাঠখোট্টার দেশে, যে দেশ সামনে এগুবার পথঘাটেরও উপযোগী নয়—তেমন দেশে আটকে লাভের চেয়ে অলাভ হবে বেশী। এমন কি এদের যদি বেশী সংখ্যার শত্রু-সৈন্য আক্রমণ ক'রে আড্ডায় থাকা অসুবিধাজনক ক'রে তোলে, তাহলে আরও সৈন্য পাঠিয়ে এদের বার করে আনতে হবে। তারপর এটা ভুললে চলবে-না যে, বিগত যুদ্ধের পর ভারতের সৈন্যসংখ্যা বহু পরিমাণে কমিয়ে ফেলা হয়েছে। ৯ ডিভিজনের স্থানে ৪ ডিভিজন পদাতিক রাখা হয়েছে, আর ৮ ব্রিগেড অশ্বারোহী সৈন্য রাখা হয়েছে। এর থেকে ভাগ-বাটোয়ারা চলে না। তাহলে সীমান্ত রক্ষা করার কি হবে? Frontier constabulary সংখ্যার ডবল ক'রে দেওয়া হক। এক কোটি টাকা খরচ ক'রে Lateral communication—পাশাপাশি ঘাঁটিতে যাতায়াতের পথ—খোলসা রাখতে হবে। Wireless, Telephone যেমন খাটাতে হবে, তেমনি মোটর ব্যবহার করতে হবে। চিগা বা ঠেঙ্গাড়ে তাড়ান গ্রাম্য সমিতিগুলিকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তুলে উত্তমরূপে সশস্ত্র করতে হবে। সীমান্তের সুশাসিত গ্রামগুলিকেও সশস্ত্র করতে হবে। সীমান্তের গোলযোগ দূর করার জন্য আগের মত বিশেষ সীমান্ত সৈন্যদল গঠন করা চাই। এই রকম বন্দোবস্ত করলে Wazirstan থেকে সব সরিয়ে আনা যাবে। তাতে বিপদ আর খরচ এই দুই বেঁচে যাবে।

এই সঙ্গে আফগানিস্তান সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে রাখা উচিত। আফগানিস্তান ইংরেজকে বরাবর সন্দেহের চক্ষে দেখে। তিন তিনবার যারা কাবুলীর দেশে তলোয়ারের জোরে ঢুকেছে, তাদের ভয়াবহ মনে করা আশ্চর্য্য নয়। তা ছাড়া সম্প্রতি খাইবার পথ পার হয়ে লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত যে রেল তৈয়ার হয়েছে, সেটা থেকে আমীরের ভয় ও দুর্ভাবনা হওয়া সম্ভব। নিঃসন্দেহ আমীর আমাদের ওয়াজিরস্তান দখল পছন্দ করেন না। হাঁ, যদি এ পক্ষের যথেষ্ট টাকা আর সৈন্য থাকত, আর যদি দশ বছর শান্তিতে কাটবে—এটা কেউ গেরাণ্টি দিত, তাহলে কথা বলবার কিছু ছিলনা। কিন্তু তা যখন হচ্ছেনা, তখন এটা কি বোকামি নয় যে এমন ২৭, ১০ ০০০ লোক দাবাতে যাওয়া হচ্চে, যাদের চৌদ্দ বছরের বেশী বয়সের সব পুরুষমানুষ লড়নেওলা আর হাতে পয়লা নম্বরের অস্ত্র রাখে। কোন একটা পাহাড়ে উপজাতিকে দখল করার মানে হবে—Tochi থেকে Mala-kanda পর্য্যন্ত সব অসভ্য জাতকে ক্ষেপান। আফগান যে ও অবস্থায় পেছনে পেছনে কারসাজি করবে না, তা বলা যায়-না।

স্বীকার করা হোক আর না হোক, এটা ঠিক যে আমীর পাহাড়েদের নিজের লোক বা কতকটা আত্মীয়গোছের মনে করেন। প্রত্যেক আমীরই চাইবেন, ইংরেজ আর আফগানিস্তানের মধ্যে Buffer State (চাপসহ রাজ্য) এর মত একটা যায়গা যেন থাকে। কেননা এর ভিতর দিয়ে তিনি গোপনে ইংরাজকে দমাতে পারেন।

ইংরেজও পাহাড়েদের না ঘাঁটালে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে পারেন। আসল মুস্কিল হচ্ছে, তাদের সৎপথে থেকে সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনে নিযুক্ত রাখা।

তা হ'লেও এদিকে লক্ষ্য রাখাটা দরকার। আর একটা ভুল করা হচ্ছে এই যে খাসাদার সৈনিকরা ঘরে ব'সে মাসে ৩০ টাকা মাইনে পায়—তাতে অন্য সেপাইদের কম মাইনেয় বিদেশে কাজ করার দরুণ মনে অশান্তি উৎপাদন করবে। ভারতের পক্ষে এগিয়ে আরও সম্পত্তি সঞ্চয়ের চেয়ে, যা আছে তাই রক্ষা করাই সঙ্গত। এর উপায় হচ্ছে আফগানিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করা, পাহাড়েদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করার চেষ্টা পরিহার করা, সীমা ছেড়ে এগিয়ে ঝঞ্চাট না বাড়িয়ে বরং যতটা পারা যায় কমিয়ে ফেলা, সুরক্ষিত সীমান্তের মধ্যে বেসামরিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা; আর তার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য Local Frontier Force—এবং খাইবার ও বোলানপাশ ভারতসরকারের অধীনে রাখা। বদমায়েসী করলে উড়োজাহাজ দিয়ে বোমা নিক্ষেপ করা, মেসিন গান চালিয়ে দুর্ব্বৃত্তদের শিক্ষা দেওয়া; এই হলে যথেষ্ট হবে।

এই গেল একদলের কথা। যারা এগিয়ে যেতে বলে তাদের কথা এইবার ভেবে দেখা যাক। তারা বলে—যতটা এগুন হয়েছে তার চেয়ে পেছনো চলে না। কেননা তাতে দুৰ্দ্ধর্ষ জাতিদের কাছে মানসম্ভ্রম হানির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণান্তকারী বিপদও আছে। প্রধান সেনাপতি বলেন, ওয়ানা থেকে সৈন্য চলে এল, তাতে কিছু হল-না। কিন্তু যখন মাসুদ মুল্লুক Takki Zam থেকে সৈন্য উঠিয়ে

নেবার গুজব রটে গেল (Feb. 1923) তখন মাস্থদরা বীভৎস কাণ্ড আরম্ভ করে দিল। এতে বোঝা যাচ্ছে মাস্থদের দেশে থেকে তাদের দমন ক'রে না রাখলে শান্তির আশা বৃথা। মাস্থদ-রাই আসল পাজী। ভারতের গুঁতোর জোরের আভাসটুকু পেলে তারা সুশীল ও সুবোধ বালকের মত ব্যবহার শিখবে। Close door Policyর ('ফাটক বন্ধ হ্যায়' নীতি) বড় একটা যুক্তি—টাকার অকুলান। কিন্তু এখানকার পেট্রোলিয়ামের খনি, কয়লার খনি ও অন্যান্য খনিগুলির কাজ চললে, Irrigation চালিয়ে চাষ-আবাদের বন্দোবস্ত করতে পারলে ভবিষ্যতে আয় বড় কম হবে না। ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের নিযুক্ত করা মানে প্রথমটা শান্তির আবরণে কাজ কারবার গড়ে তোলা। তার মানে সুশাসনের ব্যবস্থা; তার মানে খরচ পত্র করে' রাস্তাঘাট বানিয়ে, আইন-আদালত স্থাপন ক'রে কাজ আরম্ভ করা।

তারপর শুধু টাকা দেখলে ত চলবে না। এটাও ভাবতে হবে যে ভারতের আত্মরক্ষার জন্য তার সীমান্ত সুদূর প্রসারিত হওয়া দরকার। যদি মন্দ দিন কখনও আসে, তাহলে যেন শত্রুর সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ ভারতের বাইরে হয়। তা হলে ঘর সামলাতে সময় পাওয়া যাবে। যুদ্ধশাস্ত্রের এ কথাটাকে ত উপেক্ষা করা চলে না।

ডুরাণ্ড লাইন অবধি এগুতে গেলে সাময়িক ভাবে যে খরচটা করতে হবে, তা করে গেলে ফলে যে মস্ত লাভ হয় তাওত দেখা দরকার। প্রথমতঃ দুর্দ্দান্ত পাহাড়েদের সামনে পিছে আটঘাট বাঁধা থাকলে স্থায়ী শান্তি পাওয়া যাবে। মাঝে মাঝে ছোট

খাট কিছু ঘটলেও আজ কালকার বিরাট ব্যাপার ত আর ঘটবে-না। বছর বছরের এ খরচটা বাঁচলে আসলে লাভ অনেক হবে। তাতে পরে করদাতাদের করভার লাঘব হয়ে যাবে। তারপরে শান্তির দোহাই দিয়ে সীমান্তের সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া যাবে। সর্ব্বশেষে সৈন্যদের স্বাস্থ্য ও তদানুসঙ্গিক অপচয়ের কথাটা ধরা যাক। ডুরাণ্ড লাইনে অনেক স্বাস্থ্যকর জায়গা আছে, যেখানে Cantonment করা চলে। সিন্ধু নদীর তীর অন্যপক্ষে বেজায় অস্বাস্থ্যকর জায়গা। ওই সব স্বাস্থ্যকর জায়গায় সেনা-নিবাস উঠিয়ে নিয়ে এলে তারা যেমন কাজের উপযুক্ত থাকবে, তেমনি তাদের রোগ কম হওয়ার দরুণ খরচও অনেক কমে যাবে। আর এক কথা। অভিজ্ঞতায় বলে শুধু উড়ো জাহাজ চেপে বোমা মেরে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়নি। লোকেরা গুহায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। মাটির সামান্য ঘর চুরমার হলেই বা কি? অল্প পরিশ্রমে ও স্বল্প ব্যয়ে তা' একরকম করে খাড়া করে বা মেরামত করে নেয়। সৈন্যাভিযানের সঙ্গে উড়ো জাহাজে বেশী ফল পাওয়া গেছে। সুতরাং সৈন্যদের ছাউনি তুলে এনে শুধু এরোপ্লেনের উপর নির্ভর করলে চলবে না। বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করলে হয়ত বেশী ফল হত। কিন্তু Washington Conference ত সে পথও মেরে রেখেছে।

সিন্ধু নদীর তীরে ফিরে আসার বিরুদ্ধে এই বলা যায় যে চিরকাল আক্রমণকারীরা পার্ব্বত্য পথ দিয়ে এসেছে। সে পথ মুক্ত করে দিলে নবাগত শত্রু অবাধে সিন্ধু তীরে উপস্থিত হবে, আর ভারতের যে কোন স্থানে ঘা দেবার সুবিধা পাবে।

সেই জন্য নিরাপদ হতে হলে তাকে সঙ্কীর্ণ জায়গায় অসুবিধার মধ্যে লড়তে দিতে হবে। সে জায়গা প্রহরী-বেষ্টিত পার্ব্বত্যপথ। আজকালের দিনে নদীর বাধা কোন বাধা নয়। রণনীতি বলে, যাকে বাঁচাতে চাও তাকে পিছে ফেলে এগিয়ে গিয়ে লড়, তার ওপর নয়। বেলজিয়ম আর ফ্রান্স আত্মরক্ষার লড়াই নিজের দেশে লড়েছিল, সেই জন্য জার্ম্মানী হারলেও যুদ্ধের বীভৎসতা সেখানে প্রকাশ পায়নি। যা কিছু হয়েছে তা ফ্রান্স আর বেলজিয়মে। আবার বেলজিয়মের ঘাড়ে ধ্বংসের পালা আগে আরম্ভ হওয়ায় ফ্রান্সের বহু সুবিধা হয়েছিল। নৈলে তার আরও ক্ষতি হত; Buffer stateএর ব্যবহারই এই। কাজেই এখন পিছিয়ে আসা মানে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো বাঁধা। তা ছাড়া সিন্ধুতীরে ফিরে এলে পাহাড়ীরা উৎপাত এখানেও এসে করবে। *

সমরনীতির অনুশাসন মেনে সিন্ধু পার হ'য়ে যদি সীমান্ত স্থাপন করতে হয়, তাহলে পর্ব্বতের পাদমূলে না থেকে পর্ব্বতে আরোহণ:করাই ভাল। তাতে পাহাড়ের আড়াল থেকে শত্রুরা ভারত-সৈন্যদের উপর সহজে চাঁদমারী করতে পারবে না।

---

* কোন্ উপজাতি কোথায় উৎপাত করে, তার একটা খসড়া ধরা যাক। মোমন্দরা পেশোয়ারে তুলতান করে। Zakha khelরা বড়া উপত্যকা দিয়ে পেশোয়ারে আসে। এখানে তাদের চর আছে। কোহাট তরফে আফ্রিদিরা খাচন কোঁদন করে। বান্নু হচ্ছে ওয়াজীরদের আড্ডা।—এদের মধ্যে মাহ্সুদ আছে এবং দরবেশ খেলও আছে—। সব জায়গায় ঐসব দুরন্ত লোকদের চেলা চামুণ্ডা বা আশ্রয়দাতা অথবা সহায়ক সহযোগী আছে। বিনা গৃহ শত্রু কোথাও ভারী বিপদ ঘটে না।

Sandeman peaceful penetration—শান্তির আবরণে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল বলেই না আজ কোয়েটার কল্যাণে বেলুচিস্থান ঠাণ্ডা? এমনটিত Wazirstan এও হতে পারে। তা ছাড়া এও দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে সুশাসিত স্থান আর ডুরাণ্ড লাইন লাগালাগি, সেখানে পাহাড়ীদের অত্যাচার নাই। যেখানে দুটোর মধ্যে অনেকটা ব্যবধান আছে, সেইখানেই যত গোল।

সেইজন্য বলা হয় পুরান Cantonment Jacoabad, Dera Gazikhan, Dera Ismail khan, Banu, Kohat, Peshwar এর মত ভয়ানক গরম অস্বাস্থ্যকর, নানা পীড়ার উৎপাদক স্থানগুলি ছেড়ে কোয়েটা, Fort Mwnro, Razmak, Dardoni, Parachunar, Landi Kotal ও Landi Khanaতে সৈন্যশিবির তুলে নিয়ে যাওয়া উচিত।

তা ছাড়া বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা, সভ্যতা, সাধনা না নিয়ে গেলে পাহাড়ীদের বর্ব্বরতা দূর হবে না। পথ, ঘাট, রেল, কল-কারখানায় কাজ করলে তাদের দারিদ্র্য দূর হবে। পেটের জ্বালা গেলে অন্যায় বা অপকর্ম্ম আপনি কমে যাবে। তা করেও এগিয়ে যেতে হবে।

নিজেরা সব চলে এসে ওদেশী সৈন্যদের ওপর নির্ভর করা বাতুলতা। ১৯১৯ সালে আমীরের ডাকে তারা ইংরেজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল। তাদের ওপর ষোলআনা নির্ভর করা আর চলে কি? সৈন্য কমানর পর ওসব জায়গায় ছাউনী করা বুদ্ধির কাজ নয়—যারা বলেন, তাদের উত্তরে এই বলা যায় যে বর্ত্তমানে বিজ্ঞান-সম্মত কলবল ও যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত হলে
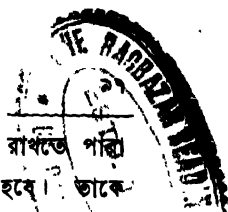
লোকসংখ্যা কমিয়ে দিয়েও আদত সামর্থ্য ঠিক রাখতে পারা যায়। আফগানিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব ত রাখতেই হবে। তাকে মজবুত হ'য়ে আপনার পায়ে দাঁড়াবার শক্তি ফুটিয়ে নিতেও দিতে হবে। তবুও এটা ভুললে চলবে না যে, আফগান দরকারমত আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার রাখবে না। সে কখনও ভুলতে পারবে না যে, রুসের সঙ্গে রেষারেষি ক'রে ইংরেজ নিজের স্বার্থে গায়ে প'ড়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে প্রথম দুবার আফগান যুদ্ধ করে। একবার নিজের হাতের লোককে ঘাড়ে চাপিয়ে আমীর বানাতে চেয়েছিল। এই যে সেদিন খোস্তে বিদ্রোহ হ'ল, তাতে ইংরেজের হাত আছে বলে তারা সন্দেহ করে। তাদের ধারণা বেনারস থেকে ইংরেজের আস্কারায় পালিয়ে গিয়ে কাবুলের সিংহাসনে ভাগ বসাতে চেয়েছিল। সুতরাং ইংরাজের ব্যবহারে কাবুল শুধু সন্দিহানই র'য়ে গেছে। তবে আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রাধান্যের জন্য সুবিধামত সে একবার ইংরেজের দিকে ঢলবে, একবার রুশের দিকে ঢলবে। প্রয়োজনমত আবার পাহাড়ীদের নিয়ে ভারত-আক্রমণও করতে পারে। ভারতেরও কতকগুলি অজ্ঞ লোক আছে যারা প্যান-ইস্‌লামে মেতেছে। তাদের হাবভাবে আমীর আবার জালে পা দিতে পারে—১৯১৯ সালে যেমন দিয়েছিল। কাজেই আমীরের উপর কতটুকু বিশ্বাস রাখা চলে?

সংক্ষেপে রাজনৈতিক, রণনৈতিক কথা-কাটাকাটির ছবি দেওয়া হল। তবুও এতে সব কথা বলা হল না। আমাদের কথা আমরা পরের অধ্যায়ে বলব।

এগিয়েযানেওয়ালাদের তরফ থেকে পক্ষ সমর্থন ক'রে যে একটা কাজের হিসাব দিয়েছে, তাতে কর্ম্মে অধিকারের সঙ্গে ফলে অধিকারও প্রমাণ করতে চেয়েছে। সে হিসাবমতে গত চারবছরে লুটপাট শুধু কমেনি, ব্রিটিশ প্রজার হত্যা, চোট-খাওয়া আর লোপাট হওয়াও কমে গেছে। Dera Ismail Khan, Banu, Kohat ও Peshwar নিয়ে এই ছকটী উঠেছে।

	১৯১৯-২০	১৯২০-২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩
Peshwar	১৪৬	৫৭	১৫	২০
Kohat	১৪২	১০১	৪৪	৩২
Banu	১২৬	১৪৯	৭৮	২৪
D. I. Khan	১৯৮	৮৪	৫১	৪৯

এথেকে দেখা যাচ্চে, শুধু পেশোয়ারে ১৯২১-২২ এর চেয়ে আক্রমণের সংখ্যা বেড়েছে, আর তিনটিতে কমেছে।

ব্রিটিশপ্রজা—	হত	আহত	ধৃত
১৯১৯-২০	২৯৮	৩৯২	৪৬৩
১৯২০-২১	১৫৩	১৫৭	৩১০
১৯২১-২১	৮০	৭২	১৪৮
১৯২২-২৩	৪৭	৪৮	৬০

এদিক দিয়েও অনেক কম ক্ষতি হয়েছে। বিশেষতঃ ধৃতের সংখ্যা খুব কমে গেছে। সাধারণতঃ ধৃত ব্যক্তিদের টাকা দিয়ে খালাস করে আনতে হয়। এটা পাহাড়ীদের একটা পেশা। কিন্তু অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মকুশলতায় এ খরচটাও অনেকটা

কমেছে। ১৯২২-২৩ সালে ৬০ জন জন ধৃত ব্যক্তির মধ্যে ৪৩ জনকে বিনা খরচায় ছাড়িয়ে আনা হয়েছে।

লুটে নেওয়ার মবলগ টাকাও বহুপরিমাণে হ্রাস হয়েছে।

১৯১৯-২০ সালে লুট হয়েছিল ২১, ৩০, ২০৯ টাকা।

১৯২২-২৩ „ „ „ ৭৭, ৫৪০ টাকা

কিং কর্ত্তব্য

এ পর্য্যন্ত যা আলোচনা করা গেল, তা থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবীর শান্তিযুগ বহু দূরে—তলোয়ার ভেঙ্গে লাঙ্গলের ফলা হতে ঢের দেরী। কাস্তে ভেঙ্গে করতাল সবাই গড়াবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। মানব-প্রকৃতি থাকতে গেলে 'পাষণ্ডের' দল থাকবেই। Varsailles সন্ধি আর Washington Conference বা Locarno Pact চিনি-মাখান কুইনাইনের বড়ির মতও সুখসেব্য হতে পারেনি। Kellog Pact তথৈবচ। তার উপর আস্থা কি? বরং জাতে-জাতে নানামুখী বিরুদ্ধ স্বার্থ নিয়ে যে বহুমুখী সংঘর্ষ বেঁধে উঠেছে, তাতে করে অদূর ভবিষ্যতে আর একটা রণডঙ্কা বাজল বলে। কুরুক্ষেত্রযোগ পৃথিবীর যে দিকটা দিয়ে

যাবে, সে দিকটা কত ছারখার হবে তার ইয়ত্তা নাই। উৎ-পীড়িতের হৃদয় মথিত ক'রে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-বেগ যে অসীম ব্যথার সৃষ্টি করেছে, শান্তি পাবার আশায় সে অনুভূতি বিপ্লবের রুদ্র তাণ্ডবে মাততে চায়। একটা সৃষ্টিছাড়া বীভৎস উপলক্ষের ভিতর দিয়া কল্যাণের সে অজস্রধারা উন্মুক্ত হয়ে আসতে চায়। সে অজানা সুর ধরণীর তপ্ত বক্ষের উপর আসন্ন বর্ষার শীতল বাতাসের লহর তোলে। অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় উদ্বেলিত ক'রে, চিত্তকে আচ্ছন্ন ক'রে যে অন্ধ ইচ্ছা, যে দেখার ব্যাকুলতা জাগবে তা হচ্ছে এই 'সে আসবে—সে আবার আসবে, এবার ভীমা ভয়ঙ্করাকে সঙ্গে নিয়ে ভেরী নিনাদে বাঁধনে-মরার দেশে আসবে, সেদিন দুঃখীর দুঃখের অবসান হবে ।'

একদিকে এই স্বপনের ধোঁয়া, খেয়ালীর খেয়াল—হতে পারে কবির কল্পনা—যেমন বঞ্চিতদের পেয়ে বসেছে, অন্যদিকে তেমনি কল-শিল্পের দৈত্যে দৈত্যে ঠোকাঠুকি লাগবার সূচনা হচ্ছে। শক্তির ঔদ্ধত্যে, দর্পে, দম্ভে, মরণ ছড়াছড়ির অশুভ প্রচেষ্টা তেমনি একটা শ্বাসরোধী মাতামাতি টেনে আনছে। অলক্ষ্মী ব'লে দূরে ঠেলে রাখতে চাইলেও অকল্যাণ তার সম্মোহন পরিহার করবে-না। যার যেখানে ব্যথা সেইখানে সে হাত বুলিয়ে জুড়াতে চাচ্ছে। যাদের কাঁধের উপর মাথা আছে, তারা অনাগতের কথা ভেবে অন্ধিসন্ধি বেঁধে রাখছে। ভারতের কথা জগৎ-চিন্তাময়ী ছাড়া কি আর কেউ চিন্তা করছে ?

আজ আমার ঘরে আমি ফকির! সর্ব্বস্ব আমার, কিন্তু চাবি কাঠিটি ইংরেজের হাতে। এ অবস্থায় 'ভানুমতীর খেলা'

এসে কি মরা মানুষ জ্যান্ত করবে? আমাদের প্রাণে আগ্রহ আছে, বক্ষে ব্যাকুলতা আছে, দেশমাতৃকার প্রতি মমত্ববোধও একটা জেগেছে, ভাবনা চিন্তাও এসে জোটে—কিন্তু নাচার! আর ওরা—ইংরাজেরা? ওরা—ওরা। আমরা—আমরা। ওদের দিক দিয়ে ওরা যা দেখে তা আমাদের ভালর জন্য অনেক সময় নয়। বাঁধন আরও শক্ত করবার জন্য হতে পারে, পায়ের বেড়ির স্ক্রুটা আরও টাইট করার জন্য হতে পারে; কিন্তু আমাদের জন্য আমাদের যে দরকার তার জন্য নয়।

ভারতের দুর্ভাগ্য, ভারতসন্তান অলস, উদাসীন—ভারত পরাধীন। পরাধীন হ'লেও; আধমরা হ'লেও মানুষের দাবী-দাওয়া মানুষ করেই থাকে। আমাদের ভিতরও তার ব্যতিক্রম নাই। মানুষ যদি মনুষ্যত্বের দাবী, প্রাণের মূল্যের দান ধার ক'রে দুনিয়ার খেলাঘরে পণ করে খেলতে বসে, তা হলে তার অভিযোগ বিধাতার এজলাসে শুনানী পেয়েই থাকে। বাঁচবার ইচ্ছার মত জাগবার ইচ্ছাও কালে সংক্রামক হয়ে পড়ে। পরস্পরকে জাগিয়ে রাখবার জন্য পরস্পরের মনোভাবের আদান-প্রদান চলা আবশ্যক। জীবনকাঠি-মরণকাঠীর ঘা লেগে লেগে চেতনা অসাড়তা কাটিয়ে ওঠে। তাই আমরা চর্ব্বিত চর্ব্বন ছেড়ে দিয়ে জাগ্রত চৈতন্যের প্রেরণায় সমর-সঙ্কট সমস্যার আলোচনা করব।

আলোচনা

আমরা আগেই দেখেছি বাইরে থেকে দুটো শক্তি ছুটেছে প্রাচ্যে নতুন মীমাংসা আনয়ন করতে। দুটো শক্তির একটা পাশ্চাত্য আর একটা প্রাচ্য হ'লেও স্বার্থের খাতিরে .অপরটার সঙ্গে তার সাময়িক মিল হওয়া আশ্চর্য্য নয়। বরং ঘটনাস্রোতে সেটা খুবই সম্ভব মনে হয়। রুশ ও জাপান দুয়েরই দরকার ইংরেজের প্রাধান্য খর্ব্ব করা। ইংরেজের টুটি চেপে ধরতে গেলে তার সাধের ভারতে শত্রুভাবে বা অমিত্রভাবে ঘা দেওয়া চাই। • এর ওপর প্যান-ইস্‌লাম আছেন। ওটাও হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যদিও তার সার্থকতার দিকে শূন্যতা তাকিয়ে আছে। তবুও মূর্খ 'অজ্ঞ' গোঁড়া কতকগুলি লোক আছে যাদের সঙ্গে আফগানের গোপনে ষড়যন্ত্র চলতে থাকবে। আজ অন্ধকারের

গর্ভে যা আছে, কালে তা ফুটে বেরুবে। আগে আগে বিচার করে দেখা গেছে, নানা কারণে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অনেক-গুলি জাতি মিলে বিশ্ব আলোড়ন করতে লেগে যাবে। আগেকার শত্রু-মিত্র উল্‌টে পালটে নতুন নতুন পক্ষ তৈয়ের হবে। যেখানে, যবে, যে কারণ নিয়ে ছাই চাপা আগুন জ্বলে উঠবে, তার সম্পর্কে ভারতের দুর্দ্দিন জল স্থল ও আকাশ-পথ দিয়ে আসবে। কেমন করে আসবে সে আলোচনাও আমরা আগে করেছি। অন্যান্য দেশ প্রাণ বাচানর উপায়টা নিজের হাতে রেখেছে—কিন্তু আমাদের পক্ষে ওটা নিষিদ্ধ-রাজ্য, ওখানে আমাদের প্রবেশ-নিষেধ।

গত যুদ্ধে ইংরেজের নৌবহর সাগরপথে শক্তির একচ্ছত্র আধার থাকায়, আর জাপান তার সখাভাবে প্রাচ্যে শান্তিরক্ষার ভার নেওয়ায়, ভারতে আঁচড় লাগার আগে ইংরেজ অনেক সৈন্য এনে ফেলতে পেরেছিল। কিন্তু এবার তার সম্ভাবনা নাই বা না থাকতেও পারে। এবার সাবমেরিন ও উড়োজাহাজ যুদ্ধের জাহাজের ইজ্জৎ মেরে দিতে পারে। আবার নব আবিষ্কৃত অস্ত্র নৌবহরের ঝাঁককে ঝাঁক বেকার ক'রে আপন কর্ম্ম সেরে নিতে পারে। অথচ আমরা 'যে তিমিরে সে তিমিরে'। তখনকার দিনের মত আজও আমরা 'ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দ্দার'। রাশিয়া অবশ্য প্রথমে গৌন উপায়ে চেষ্টা ক'রে পরে বৃটিশবিমুখ আফগানকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্য পথ অবলম্বন করতে পারে। জাপান বা চীন-জাপানের পথ প্রশস্ত। আফগান একলা কিছু না ক'রে 'পাঁচে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজে'র

পথ নেবে। প্রশ্ন হতে পারে—আমাদের তাতে কি? আমাদের ভাববার স্বত্ব-স্বামিত্বই ত নাই! কোন্ অধিকারে আমরা অনধিকার-চর্চ্চায় রত হব? ভারত আমাদের দেশ হলেও আজও ত স্বদেশ হয়নি। ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ম্মকেন্দ্রে আমাদের স্থান কোথায়?

আমরা বলি, ইংরেজ পরের ধনে পোদ্দারী করলেও দেশের প্রাণশক্তি আপন চেষ্টায় মুক্তির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আজই হোক আর কালই হোক, ভারত পরিবর্ত্তনের পরদা উল্টে' জগৎ সভায় ইংরেজর সঙ্গে সমানে সমানের মৈত্রীর সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হবে (Alliance with equal status)। সেই নির্দ্দিষ্ট অনাগত স্বপ্নকে মূর্ত্তিতে ধরার অধিকারে আমরা এসব সমস্যার বিচারে বসব।

প্রথমেই বলে রাখি, যদি সম্ভবপর হয়, রাজনৈতিক, সমর-নৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে ইংরেজের সঙ্গে অন্ততঃ কিছুদিন পর্য্যন্ত একটা সম্বন্ধ আমাদের রাখতে হবে। সে সম্বন্ধটা দাস-প্রভুর না হয়ে পরস্পরের হিতার্থ দুটী মিলনেচ্ছার বিকাশ নিয়ে হবে। তা বলে এর মানে এই নয় যে জাতীয় আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে শুধু খেয়ালের বশে মিলের জন্য ভারতকে ইংলণ্ডের সঙ্গে মিলে থাকতে হবে। ত্যাগ, ক্লেশ ভোগ ও কর্ত্তব্যের পায়ে বলি দিতে এগোয় যে জাত, তার একটা গতি হয়েই যায়। এটা স্বীকার করার পর কথা হচ্চে যে আমাদের নিজদেশ, বন্দর, সমুদ্রপথে অবাধ যাতায়াত, খবরাখবরের পথ ও উপায়গুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারতের একটি নিজস্ব নৌবহর থাকবে।

নৌযুদ্ধ শিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি Depot ship বা Training ship থাকবে, যাতে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবে। সম্প্রতি এই নামে যা করা হয়েছে সেটা একটা মূক অভিনয় গোছের জিনিষ বল্লেই হয়। শিক্ষক হবে ইংরেজের কাছে ধার করা পাকা নৌযোদ্ধা কয়েকজন। তাদের উপযুক্ত মাইনে আমরা দেব। যুদ্ধ-জাহাজের শুধু সেনা-মোল্লা নয়, অফিসারও হবে ভারতবাসী। এদের ভিতর থেকে বেছে বেছে লোক নিয়ে বিলাতে এবং অন্যান্য দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠান হবে। সে শিক্ষার Practical aspect পাকা ক'রে নেওয়ার দিকটা হবে—ইংরেজের আদত মানোয়ারী জাহাজে কিছুদিন থেকে কাজ করে আসা। স্বাধীন চীন অধুনা এই রকম ব্যবস্থা করেছে। বর্ত্তমান লাট কাউন্সিলে একজন বৃটিশ Flag-ship এর পুরাণ কর্ম্মচারীকে ভারতের Navy গড়ে তোলার কাজ দিয়ে নিযুক্ত করা উচিত। ওরকম একজন লোকের অভাবে দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মত Navyর বদলে Indian Royal Marine নামক আজগুবি জীবটি নিয়ে তুষ্ট থাকলে হবে না। Royal Marine সৈন্যদের একদেশ থেকে অন্যদেশে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে। লড়াই সম্বন্ধে সেটা একটা নকলিমাল। আমাদের Navy চাই—তার আনুসঙ্গিক যা দরকার তা চাই। অবশ্য Indian Merchant Marine সম্বন্ধে দেশের এই নব মনোভাবকে আমাদের সমর্থন করা ছাড়া অন্যমত নাই।

উড়োজাহাজের জন্য ভারতে একটা কারখানা খোলা চাই।

অন্ততঃ যেমন ক'রে আমাদের Aerial fleet চলতে পারে, তা করা চাই! আজকাল উড়ো জাহাজ সবাইয়ের হয়েছে, আমরা পেছিয়ে থাকতে পারি না। একে দিয়ে দিকদর্শন বা স্থান নিরূপন (reconnoitring), আকাশ থেকে মেসিনগান চালান, বোমা-নিক্ষেপ, খবরাখবর প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ভারতবাসীদের শিখিয়ে ভারতবাসীদের Aerial fleet করতে হবে।

Militaryতে আমাদের প্রকৃত গোলন্দাজ করতে হবে। এখন যা আছে সে কিছু নয়; সেটা একটা ফক্কিকারী। সামরিক বিভাগে আমাদের যে অনুযোগ আছে, তা দূর করতে হবে। আমাদের অভিযোগগুলি এই :—

[১] Mont-ford Act এর আগে ভারতবাসীদের ইংরেজ সমশ্রেণীস্থ জঙ্গী কর্ম্মচারী করা হত না। Non commissioned পদে তাদের স্থান ছিল। তারা সব গুণের অধিকারী, সাহসী, বীর অভিজ্ঞ হ'লেও একজন নিতান্ত কাঁচা নতুন Subaltern এর অধীন তাদের থাকতে হত। এখনই বা কি হয়েছে? বছরে প্রায় ১৪০ জন অফিসারের মধ্যে এপর্য্যন্ত দু চার জন ডেরাডুন কলেজ থেকে পাশ করা হয়েছে। অন্ততঃ শতকরা ৩০ জন ভারতবাসী নেওয়ার ব্যবস্থা এখনই হওয়া উচিত। পরে প্রতি বছরে আরও ২০ জন ক'রে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। একটা আপত্তি ভারতের বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে উঠতে পারে যে, ভারত-বাসীরা ভাল সৈন্য হলেও অফিসার হবার উপযুক্ত নয়।

সত্য কথা বলতে গেলে, যে শিক্ষায় মানুষ রণচণ্ডীর. বরপুত্র

হতে পারে, হিসেব নিকেশ করে ইংরেজ ভারতবাসীকে সে শিক্ষা থেকে দূরে রেখেছে। ভারতের এই সেদিনকার ইতিহাসেও রাজপুত, মোগল, শিখ, মারহাট্টার মধ্যে এমন অনেক নেতা উঠেছিল, যারা রণপ্রতিভার উজ্জ্বল রত্ন বলে পরিগণিত হত। শিক্ষা পেলে পাশ্চাত্য ঢংএ এখনই বা কেন উপযুক্ত মাথাওয়ালা লোক বেরুবে না? ভারতীয় অফিসার যা নেওয়া হচ্ছে, তাও ঐ পদাতিক আর অশ্বারোহীতেই পরিসমাপ্ত। মোট ৪০০০ অফিসারের মধ্যে যা নেওয়া হয়েছে তা গোষ্পদের পানি।

(২) পাছে সৈন্যদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব পরিস্ফুট হয়, তাই আজ কাল নিছক জাতি নিয়ে কোন রেজিমেণ্ট রাখা হচ্ছে-না। দেশী বিলিতি সব রকম মশলা একসঙ্গে মিশিয়ে যা হচ্ছে, তা কাজ চালান কল হলেও প্রতিভা খুলবার বিরোধী।

(৩) Tank corps, Armoured car company ও Air force এ ভারতবাসীর প্রবেশ নিষেধ।

(৪) Royal Horse Artilleryর গোলন্দাজ কোন ভারত-বাসী হতে পারে না। শুধু Pack Artillery ও Frontier Garrison Artillery & Indian coast Artillery তে তাদের মহলা দিতে হয়।

(৫) সহযোগী বিভাগগুলিতে পর্য্যন্ত অফিসার করা হয় না। যেমন Supply & transport, Medical, Veterinary &

Ordinance, clothing, Remounts, Military training, Educational Departments. *

(৬) Auxilliary Force— স্বেচ্ছাসেবকের অন্তর্গত হলেও তার শিক্ষা খাঁটি লড়ায়ে সৈন্যের অনুরূপ। অথচ তাতে ভারত-বাসীর প্রবেশাধিকার নাই। এরা সব রকম যুদ্ধাস্ত্রে শিক্ষা পায়। এদের আপন হদ্দার বাইরে যেতে হবে না। Indian Territorialরা শুধু পদাতিক, এদের যেখানে খুসী পাঠান চলতে পারে। Auxilliary Force থেকে commissioned আফিসার হওয়া য়ায়, Territorial থেকে হয় না।

(৭) ইংরেজ ভারতের সাধারণ লোককে শুধু যে বিশ্বাস করে না, তা নয়, ভারতীয় সৈন্যকে বিশ্বাস করে না, পুলিশকেও না, দেশীয় রাজন্যদের সেপাইদেরও নয়। এটা বুঝা যায় ওদের নিরেস শিক্ষা ও অপকৃষ্ট অস্ত্র দেওয়ায়।

(৮) ইংরেজ সৈন্য এখানে রাখার দরকার নাই। ইংরেজ যদি নিজের খরচায় তাদের আনে আর নিয়ে যায় ত তাতে আমাদের আপত্তি নাই। এখন যা ব্যবস্থা আছে, তাতে আমাদের খরচায় লড়াই শিখিয়ে পাকা ক'রে অল্পকাল পরে ইংরাজ বিলাতের সৈন্যদের উৎকর্ষ সাধন করছে। এতে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। এখন দেশী সৈন্য বিলাতী গোরা সেনার আড়াই গুণ আছে। কিন্তু এখন একজন গোরার জন্য

* খুব সম্প্রতি দু-একজন লোককে Cranwal ও Woolich এ উড়ো জাহাজ ও গোলন্দাজী শিখতে নেওয়া হয়েছে সত্য। কিন্তু সে নিতান্ত লোক-ভুলান সংখ্যা মাত্র।

পাঁচজন ভারতীয় সৈন্যের সমান খরচ করতে হয়। গোরা ৬০, ৭৫৬ আর কালা ১৩৭,০৭৪ না ক'রে, দুই লক্ষ দেশী সৈন্য করলেই হয়।

(৯) ইংরেজ নতুন ব্যবস্থায় সৈন্যদের তিনভাগে বিভক্ত ক'রে কাজ দিয়েছে। Covering Army, Field Army & Internal Security Army. Covering Army একত্র এক জায়গায় থাকে; তাদের আবরণে যুদ্ধকালে মূলদল প্যাঠান হয়ে থাকে। এদের শিক্ষা একরকম হয়ে থাকে। Internal Security Army দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ থামানর জন্য রাখা হয়েছে। যেমন মপলা হাঙ্গামা, বড় রকমের দাঙ্গা ইত্যাদি। এই Internal Security Armyতে সব চেয়ে বেশী গোরা রাখা হয়েছে। Covering Army সীমান্তে থাকে, তাদের কাঁচা মাথা দেবার ডাক অহরহ পড়তে পারে. সেখানে অনুপাত হচ্ছে যে একজন গোরা থাকেত ৬৷৭ জন কালা সৈন্য থাকে। Internal Security Armyতে কাঁচা মাথা দেবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। কিন্তু সেখানে যদি একজন কাল সেপাই থাকে ত দেড় জন গোরা থাকে। এতে সৈন্যদের মধ্যে অশান্তি না হয়ে পারে না। আর ইংরেজের কথা যদি সত্য হয় যে গোরা সৈন্য কালার চেয়ে উৎকৃষ্ট, তবে আদত লড়ায়ের জায়গায় তাদের এত কম দেওয়া হয় কেন? তারপর আমরা বলি National Militia করলে সৈন্য পোষার খরচ ত অনেক কমে যায়। ভারত সরকার ৯০ কোটি টাকার মধ্যে ৬০ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা সামরিক বিভাগে খরচ করেন; বাকি পৌণে ৩০
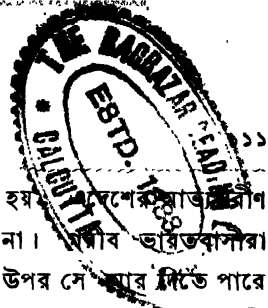
কোটি টাকায় শাসন-যন্ত্রটি কর্ম্মঠ রাখা হয়, সে দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য কিছু ব্যয় করতে পারেন না। গরীব ভারতবাসীরা যে টেক্স দেয় তাও ঢের। তার উপর সে আর দিতে পারে না। কাজেই আমরা দিন দিন অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছি। খালি তেল-চুকচুকে লাঠি আর লাঠিয়াল হলেই ত চলবে না, শরীর ভাল রাখার জন্য জাতটার ভাল খাওয়া দাওয়া, শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। তা আর হচ্ছে কই! National Militia হলে অনেক খরচ কমে যাবে।

জাপানের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, শ্যাম রাজ্য আত্মরক্ষার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা অদ্ভুত। সব রকম অস্ত্রবাহী সৈন্য (an army of all arms) তার আছে। সমুদ্রপথে দেশরক্ষার্থে অবস্থানুযায়ী যুদ্ধ জাহাজ সে রেখেছে। উড়ো জাহাজ নির্ম্মান, মেরামত, চালান—সমস্তই শিখিয়ে নিয়ে দেশী লোকদের হাতে সব ভার দেওয়া হয়েছে। National Militia তার আছে। তাই বলি জাপানের মত হতে দেরী থাকলেও শ্যামের মত ত আমরা এখনই হতে পারি। শ্যামের স্কুল-কলেজে বাধ্যতা-মূলক ব্যায়াম চর্চ্চা, আর সমর্থ পুরুষদের অন্ততঃ দু'বছর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে, তার অনুকরণ হওয়া উচিত।

এইবার আমরা সীমান্ত-নীতি সম্বন্ধে আমাদের মত ব্যক্ত করব। আফগানিস্তান ও পাহাড়ী জাতিদের সঙ্গে সখ্যতা রাখতে হবে। ওরা দুয়ে মিলে দরকারমত ২০০,০০০ সৈন্য বার করতে পারে। তার মধ্যে পাহাড়ীরা দিতে পারে ৫০,০০০। পাহাড়ীদের স্বাধীনতা আমরা স্বীকার করব। সেটা আমাদের বদান্যতার

জন্য যতটা, ততটা ‘গরজ বড় বালাই’ বলেও। প্রথমতঃ স্বাধীনতা, নিয়ম বললে ও জাতের স্বাধীনতা নেওয়া যায় না। শুধু আরও লড়াই লেগে থাকবে, যা চালানর খরচ জুটবে না। যদি আপন মনে লড়তে যাওয়া হয় ত অপমান হয়ে ফিরে আসতে হবে। তার পরও আমরা যেমন রুশ ও ভারতের মধ্যে আফগানকে একটা চাপ-সহ রাজ্যে (Buffer-state) পরিণত করতে চাই, আফগানও তেমনি অবিশ্বাসী ইংরাজ ও আফগানিস্তানের মধ্যে স্বাধীন পাহাড়ীদের একটা Buffer state দেখতে চায়। তার স্বার্থের বিরুদ্ধে জেনে শুনে গেলে ভীমরুলের চাকে কাঠি দেওয়া হবে। পাহাড়ীরা ত ক্ষেপবেই—কাবুলী ও বিগড়াবে। রুশের বিরুদ্ধে চাপ সহ্য কে করবে? তার চেয়ে আফগানের সঙ্গে সম্মিলিত হ’য়ে উভয়ের মিলিত স্বার্থ সৃষ্টি ক’রে পাহাড়ীদের সভ্যতার আলো দেবার ব্যবস্থা করা চাই। রাজনীতি ও সমর-নীতি বলে, আমরা যতটা গেছি ততটা এগিয়ে থেকে আমাদের ব্যবস্থার উপর sandeman নীতি খাটান উচিত ;—স্থানীয় সর্দ্দার-দের দিয়ে তাদের দেশ শাসন করান, আর তাদের হাতে রাখা।

তারপর ঐ পাহাড়ীরা যাতে সুবুদ্ধি নিয়ে খেতে পরতে পায় তা করতে হবে। ওদেশে সুবন্দোবস্ত ক’রে, কিছু নিরাপদের হাওয়া বহাতে পারলে কাজকারবারের প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। Irrigation ক’রে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সহজে পেটের ক্ষিদে মরলে ওরা আর হন্নে হয়ে থাকবে না। ব্যবসা বাণিজ্যের সাফল্যের জন্য রেল, পথ-ঘাট যা করা আবশ্যক, তা করতে হবে।

সীমান্তে ভারতাধিকারের গ্রামবাসীদের অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ ব্যর্থ করা, আর আক্রমণকারীদের তাড়া করার দল গড়ে তুলতে হবে। সীমান্তের জন্য নিজস্ব একদল সৈন্য থাকলে ভাল হয়। Guerilla লড়াই সবাই লড়তে পারে না। ওখানের স্থান-কাল-পাত্রের অভিজ্ঞতা ওখানেই হবে। আমরা অগ্রনীতির পূরাপূরি সমর্থন করি না—উগ্রনীতির ত নয়ই। আমাদের অগ্রনীতি-টাকে আমরা অশিষ্ট করতে চাই না। একেবারে ঠেলে এগিয়ে পাহাড়ীদের জখম করার পক্ষপাতী আমরা নই। কতকটা কায়দার ভেতর আনা মন্দ নয়।

ব্রহ্ম সীমান্তে চীনভীতি দূর করার জন্য ব্রহ্মদেশকে Autonomus status দিয়ে—আত্মপ্রধান্য-যুক্ত রাজ্য ক'রে ভারতীয় মিলিত রাষ্ট্রের অংশীদার করে রাখতে হবে। খালি জলপথে নির্ভর না ক'রে, রেল পথে ভারত ও ব্রহ্মের মিলন আনতে হবে। ব্রহ্ম-সভ্যতা ভারত-সভ্যতারই অংশ। সে লুপ্তজ্ঞান দুই দেশেই আবার জাগাতে হবে। শুধু ভৌগোলিক নয়, উভয় জাতির চিন্তা-শীল ব্যক্তিদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা এনে ফেলা চাই। উভয়ের স্বার্থ এক, সভ্যতার উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্যও এক। আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসন নিয়ে সমগ্র ভারতের সঙ্গে একত্র থাকলে লাভ, বিচ্ছিন্ন হলে মহাবিপদ। যত সত্বর সম্ভব চীনের সঙ্গে সীমান্তের গোলমাল মিটিয়ে ফেলতে হবে।

ভারত পররাষ্ট্রলোলুপ হবে না। মানসম্ভ্রম আত্মমর্য্যাদা নিয়ে প্রয়োজনমত ইংরেজ ও অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে মিতালিতে দিন কাটাবে। পৃথিবীর জাতগুলি সব মিলিয়ে পাঁচ ফুলের

সাক্ষী। সবকে নিয়ে একটা উদ্দেশ্য মহিমাময় সাফল্যের দিকে যাচ্ছে। এই বড় কথাটা ধরে চলবার দিন আনার জন্য ভারতের অবনত অবস্থা দূর করে ফেলতে হবে। ভারতের রাজনৈতিক জীবনের শৈশব পার হ'য়ে অনন্ত উৎসাহভরা যৌবনাবেগ এসে উপস্থিত। সে এখন ধূলা-খেলা ছেড়ে মানুষের মেলায় মানুষের খেলাই খেলবে। ও পাড়ার পাতান মাসী-পিসিরা এখন সাবালককে জোর ক'রে নাবালক রাখার রঙ্গ ত্যাগ করুন। তরুণ যৌবন অত বাঁধাধরা মানবে না। এমনি তাঁর হক না পেলে সে বাঁধন ভেঙ্গে মহাতীর্থের পথে পা বাড়াবে। জাতির ভাগ্যবিধাতাই ভারতকে উন্নত করবেন; গৌরবালঙ্কারে ভূষিত ক'রে জগতের হিত ও কল্যাণের জন্য যে খেলা তাকে খেলতে হবে, নিজ ইঙ্গিতে তিনি সে খেলা খেলাবেন।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

রণ-নীতিতে Strategy এবং Tactics ব্যবহৃত হয়। একথা আমরা পূর্ব্বে বলেছি। Strategy হচ্ছে রণ-চাতুর্য্য—শত্রুকে ঠকিয়ে হারিয়ে দেওয়ার কেরামতি। Tactics হচ্ছে যুদ্ধের ব্যবস্থা-কৌশল। ব্যূহ-রচনা প্রভৃতি এর অন্তর্গত। আমরা এখানে সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলব।

বর্ত্তমান রণ-নীতি

পুরাতন নীতি :—এর প্রবর্ত্তক ছিলেন নেপোলিয়ন। কিন্তু এটা সুবিস্তৃতভাবে প্রচার করেন জার্ম্মানীর ক্লসেনিটজ Clau-seneitz. এই নীতির মুল কথা হচ্ছে নির্ম্মম সংঘর্ষ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা পুরোদস্তুর লড়াই ল'ড়ে সুমীমাংসিতভাবে শত্রু-শক্তি

ধ্বংস করে দেওয়া। সশস্ত্র যুদ্ধে এ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আনতে হবে।

নব্য নীতি :—শত্রুর প্রতিরোধ করার শক্তিকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। কি ক'রে তা সাধন করা হবে? জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে নিজের সমগ্র শক্তি নিহিত ক'রে তা করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—

স্থল সৈন্য নিয়োগে—(ক) শত্রুর সশস্ত্র ও সসজ্জ সৈন্যকে ধ্বংস করা।

(খ) শত্রুর সংবাদাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ও গতি-বিধির পথ-ঘাট, যান বাহন কায়দায় আনা এবং তার কৃষি-শিল্প-জাত বৈভব আটকে ফেলা বা বেকায়দা করে ফেলা।

(গ) শত্রুর রাজকার্য্যের প্রধান আড্ডা বা জনসাধারণের কর্ম্মকেন্দ্রগুলি দখল করা।

(ঘ) প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকদের ধরে ফেলা বা তাদের স্থানভ্রষ্ট করা।

(ঙ) অত্যাচারের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস ও বিভীষিকা সঞ্চার করা। এই কর্ম্মে আজকাল বিষ-বাষ্প ও উড়ো-জাহাজ খুব ব্যবহৃত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উড়োজাহাজ কি করেছে, একটু প্রমাণ আমরা দিয়েছি। যুদ্ধের সময় জার্ম্মানরা লণ্ডন আক্রমণ করত, তা বোধ হয় সকলের মনে আছে। যুদ্ধকে নারকীয় ব্যাপার বলা হয়ে থাকে। কারণ যুদ্ধের একটা বিশেষ বীভৎস দিক আছে। বিপক্ষের স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার অনেকটা ইচ্ছা করে চোখ বুজে চলতে দেওয়া হয়। মানুষ

সব সইতে পারে, মা, বোন, স্ত্রী, কন্যার বে-ইজ্জতি সইতে পারে না। এতে লোক খ্যাপেও যেমন, দমেও তেমন। কর্ত্তৃপক্ষরা দুঃসময়ের দিনে সৈন্যদের নিজেদের স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচারের খবর শোনায় না। কারণ তারা দমে যায় এবং স্বতঃ তাদের মধ্যে যুদ্ধে বিরতি আসে। আবার যুদ্ধের গোড়াকার দিকে সৈন্য-সংগ্রহ ও সৈন্যদের উত্তেজিত করতে সত্য, মিথ্যা বা বাড়িয়ে এরকম খবর রাষ্ট্র করা হয়। ব্যাঙ্ক লুঠে, কারখানা উজাড় করে, রসদ প্রভৃতি সরিয়ে নিয়ে বাড়ী ঘরে আগুন দিয়ে দেওয়া হয় এবং আগুন নির্ব্বাপন করতে কেউ আসতে চাইলে তাকে বা তাদের আটকে ফেলা হয়। খাদ্য ও পরিধেয়-সম্ভার পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়ে থাকে।

নৌবল প্রয়োগে—(ক) প্রতিপক্ষের যুদ্ধ-রত নৌবহরকে ধ্বংস করা হয়।

(খ) শত্রুর পথ ঘাট বা খবরাখবরের বিধি-ব্যবস্থা হাতিয়ে নেওয়া হয়।

(গ) শত্রুকে শুকিয়ে মারার জন্য তার এবং তার সঙ্গে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে তাদের উভয়ের আমদানি রপ্তানি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। বিগত যুদ্ধে এই Blockade করে মিত্রপক্ষ জার্ম্মানীকে পরাস্ত করে। জার্ম্মানী যুদ্ধক্ষেত্রে হারে নাই। পরাজয় স্বীকার করার দিনও তার সৈন্য শত্রুর দেশের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরে। শত্রুর গোলাগুলির কাছে যারা হারেনি, পেটের ক্ষুধার কাজে তাদের হার মানতে হ'য়েছে। এর ফলে দেশে অন্তর্বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। বড় নিষ্ঠুর এই জাহাজী

অবরোধ। আগের দিনে নিষ্ঠুর ব্যাপারগুলো সেপাই সেপায়ে হত। বে-সামরিক লোকজন তার থেকে বাদ থেকে যেতা। বর্তমান যুগে নিষ্ঠুরতা বেড়ে গিয়ে শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রী, রোগীকেও গিয়ে স্পর্শ করেছে। নরকের উত্তাপ যে যত বজায় রাখতে পারবে, তার তত জয়াশা।